হেরমান হেস

সিদ্ধার্থ

প্রথম অধ্যায়

ব্রাহ্মণকুমার

সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থ তার বন্ধু গোবিন্দের সাহচর্যে বড় হয়ে উঠছে। বাড়ির উঠোনে, রৌদ্রালোকিত নদীতীরে, শাল ও ডুমুর গাছের ছায়ায় দুজনে ঘুরে বেড়ায়। শুচি গোসল এবং যজ্ঞ উপলক্ষে নদীতীরে নিয়মিত যাতায়াত করে সিদ্ধার্থের প্রশস্ত কাঁধে বাদামি রং ধরেছে। আমবাগানে খেলা করার সময়, মা'র গান শুনে, পিতার অধ্যাপনা শুনে এবং মনীষীদের সাহচর্যে এসে তার চোখের সামনে দিয়ে কিসের যেন ছায়া ভেসে ওঠে। এর মধ্যে সিদ্ধার্থ পণ্ডিতদের আলোচনায় যোগ দিয়েছে, এ নিয়ে গোবিন্দদের সাথে তার তর্ক হয়েছে, আর অভ্যাস করেছে একাগ্র চিন্তা ও ধ্যানের। নীরবে 'ওম্' বাক্য কীভাবে উচ্চারণ করতে হয় তা-ও শিখে নিয়েছে কৌশলে। প্রাণ খুলে নিঃশ্বাস ছাড়ার সময় বিশুদ্ধ আত্মার প্রভায় তার ললাট দীপ্ত হয়ে ওঠে। যে আত্মা অবিনশ্বর নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, সেই আত্মাকে নিজের সত্তার গভীরে উপলব্ধি করার ক্ষমতাও সিদ্ধার্থ লাভ করেছে।

পুত্রের ধীশক্তি ও জ্ঞানতৃষ্ণা দেখে পিতার মন আনন্দে ভরে ওঠে; তিনি স্বপ্ন দেখেন : ছেলে একদিন বড় হয়ে পণ্ডিত হবে, পুরোহিত হবে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হিসেবে খ্যাতি লাভ করবে। তার চলা, বসা, ওঠা, দুচোখ ভরে দেখে মায়ের মন গর্বে ভরে ওঠে; সবল, সুদর্শন, সুকুমার কান্তি সিদ্ধার্থ কী সুন্দর ভঙ্গিতে তাঁকে প্রণাম করে।

সিদ্ধার্থ যখন নগরপথে চলে তখন তার উন্নত ললাট, রাজোচিত চোখ, একহারা গঠন দেখে ব্রাহ্মণকুমারীদের হৃদয়ে প্রেমের ঢেউ জাগে।

কিন্তু তার বন্ধু ব্রাহ্মণকুমার গোবিন্দের মতো আর কেউ সিদ্ধার্থকে ভালোবাসে না। সিদ্ধার্থের চোখ, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর তার ভালো লাগে। সে ভালোবাসে তার হাঁটার ধরন, অঙ্গভঙ্গির পরিপূর্ণ মাধুর্য। সিদ্ধার্থ যে কাজ করে, যে কথা বলে সবই ভালো লাগে গোবিন্দের। তাকে সবচেয়ে মুগ্ধ করে সিদ্ধার্থের মেধা, পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা, দৃঢ় সংকল্প এবং তার জীবনের মহৎ লক্ষ্য। গোবিন্দ জানে সিদ্ধার্থের জীবন আর পাঁচজন সাধারণ ব্রাহ্মণের মতো নয়, যজ্ঞের অলস হোতা হয়ে দিন কাটানো তার উদ্দেশ্য নয়; মন্ত্রতন্ত্রের অর্থলোভী ব্যবসায়ী, যোগ্যতাহীন দাম্ভিক বক্তা, দুর্নীতিপরায়ণ শঠ পুরোহিত সে হবে না, অথবা বৃহৎ পালের মধ্যে নির্বোধ গোবেচারা ভেড়ার মতো তার জীবন কাটবে না— তা নিশ্চিত। গোবিন্দ নিজেও ওসব পথে যেতে চায় না; হাজার হাজার ব্রাহ্মণের একজন হয়ে থাকতে তার

আকাঙ্ক্ষা নেই। সে অনুগামী হবে তার প্রিয় বন্ধুর, মহৎ-হৃদয় সিদ্ধার্থের। যদি সাধনায় সে দেবত্ব লাভ করে, যদি জ্যোতির্ময় প্রভুর সাক্ষাৎ পায়, তাহলে গোবিন্দ তা অনুসরণ করবে। অনুগমন করবে বন্ধু, সাথী, ভৃত্য ও দেহরক্ষী হিসেবে; ছায়ার মতো তার সাথে সাথে থাকবে।

এমনি করে সবাই সিদ্ধার্থকে ভালোবাসে। সে আনন্দ দেয়, সুখ দেয় সকলকে।

কিন্তু সিদ্ধার্থের নিজের মনে সুখ নেই। সে সকলের প্রিয়, সকলের আনন্দের উৎস; পাকা ফল ছড়ানো ডুমুরবাগানের পথে পথে সিদ্ধার্থ ঘুরে বেড়ায়, কুঞ্জের নীলাভ ছায়ায় বসে ধ্যান করে; প্রতিদিন পূর্ণ সলিলে অবগাহন করে প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য; আর বাগানের গভীর ছায়ায় বিনীত-মধুর ভঙ্গিতে নৈবেদ্য নিবেদন করে; কিন্তু তবু তার হৃদয়ে আনন্দের অনুভূতি নেই। ঐ নদী, রাত্রির আকাশে মিটমিট তারা, সূর্যের প্রখর কিরণ তার মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে, স্বপ্ন রচনা করে। যজ্ঞের ধোঁয়া, ঋগবেদের শ্লোক, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদের শিক্ষা, তার হৃদয় ব্যাকুল করে তোলে, স্বপ্ন দেখে সে অন্য জগতের।

সিদ্ধার্থ অনুভব করে তার মনের মধ্যে দানা বেঁধে উঠেছে একটা অতৃপ্তির বীজ। সে উপলব্ধি করে পিতামাতার স্নেহ, বন্ধুর ভালোবাসা তাকে চিরদিন আনন্দ দেবে না, দেবে না শান্তি; শুধু এই দিয়ে সুখী হবে না, পূর্ণ হয়ে উঠবে না। তার মনে সংশয় দেখা দেওয়ায় সুপণ্ডিত পিতা এবং অন্যান্য বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আচার্যের কাছ থেকে এর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বিপুল অধ্যায় সে আহরণ করেছে। এরা সিদ্ধার্থের অপেক্ষমাণ জাহাজে তুলে দিয়েছেন তাঁদের মিলিত জ্ঞানের ভাণ্ডার; কিন্তু জাহাজ পূর্ণ হয়নি, বুদ্ধির তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই আত্মার, হৃদয়ের চাঞ্চল্য ঘোচেনি। পুণ্য সলিলে অবগাহন ভালো; কিন্তু পানি দিয়ে তো পাপ ধুয়ে ফেলা যায় না, লাঘব করা যায় না হৃদয়ের ভার। দেবতাদের উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা, তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানানো খুবই উত্তম; কিন্তু তাই কি যথেষ্ট? দেবতাদের সম্বন্ধেই-বা কী জানি? সত্যি কি প্রজাপতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন? অথবা একমাত্র পরমাত্মা, পরম ব্রহ্মের সৃষ্ট এই জগৎ? তোমার আমার মতো যারা মৃত্যুর বলি, যারা অস্থায়ী, তাদের আকৃতি দিয়েই কি দেবতার সৃষ্টি হয়নি? তাহলে দেবতাদের পূজা করে লাভ কী? সেটা কি উচিত ও যুক্তিসংগত? যিনি এক, অদ্বিতীয়, যিনি পরমাত্মা ও পরম ব্রহ্ম; একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উদ্দেশে কি যজ্ঞের আয়োজন করা যায়? আর কে পেতে পারে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য? আমাদের অন্তরের গভীরতম অমর সত্তায় যদি পরমাত্মার সাক্ষাৎ না পাই, তাহলে ঈশ্বর কোথায় আছেন, কোথায় তার শাশ্বত হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করা যাবে? কোথায় সেই অন্তর্নিগূঢ় ব্যক্তিসত্তা? যাঁরা জ্ঞানী তারা বলেন : অস্থিমাংসে আত্মা নেই, নেই চিন্তা ও চেতনায়। তাহলে আছে কোথায়? আত্মাকে উপলব্ধি করার আর কোনো সফলতর পথ আছে? কেউ পথনির্দেশ করে না। তার পিতা, আচার্য এবং বিজ্ঞজনেরা কেউ জানেন না পথের কথা। পবিত্র স্তোত্রেও নেই কোনো ইশারা। ব্রাহ্মণরা সকল বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন, তাঁদের শাস্ত্রগ্রন্থে সবকিছুর উল্লেখ আছে।

সৃষ্টিরহস্য, ভাষার জন্ম, খাদ্য, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অবস্থান, দেবতাদের লীলা—সবই তাঁরা আলোচনা করেছেন। তাঁরা এত জিনিস জানতেন যে, তার সংখ্যা রীতিমতো ভীতিজনক। কিন্তু এই জানার মূল্য কী, যদি না সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি জানা যায়—সবকিছুর মধ্যে যেটি একমাত্র মূল্যবান।

শাস্ত্রগ্রন্থের, বিশেষ করে সামবেদীয় উপনিষদের অনেক শ্লোকে, এই অন্তরবাসী সত্তার উল্লেখ আছে। এসব গ্রন্থের উপদেশ : আত্মৈ বেদং সর্বম্। উপনিষদে বলা হয়েছে : ঘুমিয়ে পড়লে অন্তর্নিহিত আত্মার মধ্যে আমরা বাস করি; দেহ ঘুমায়, জেগে ওঠে আত্মা। এইসব শ্লোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে আশ্চর্য জ্ঞান, ঋষিদের সাধনালব্ধ সকল জ্ঞান এখানে ব্যক্ত হয়েছে মনোরম ভাষায়; মৌমাছির সংগৃহীত মধুর মতোই তা বিশুদ্ধ। পুরুষানুক্রমে ব্রাহ্মণরা যে বিপুল পরিমাণ জ্ঞান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে আসছেন তাকে সহজে অগ্রাহ্য করা চলে না। কিন্তু কোথায় সেই ব্রাহ্মণ, পুরোহিত এবং পণ্ডিতের দল যাঁরা শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায় সুগভীর জ্ঞানরাশি সঞ্চয় করেননি, জীবনেও তাদের উপলব্ধি করেছেন? এমন দীক্ষা কার আছে পাওয়া যাবে যিনি নিদ্রার মধ্যে আত্মাকে লাভ করে তাকে জাগরণে, জীবনে, বাক্যে, কাজে এবং সর্বত্র ধরে রাখতে পারেন? সিদ্ধার্থ অনেক সুযোগ্য ব্রাহ্মণ দেখেছে। দেখেছে তার পিতাকে—ধর্মপরায়ণ, বিদ্বান, সর্বোত্তম সম্মানের যোগ্য। পিতার সম্মুখে গেলেই মন শ্রদ্ধায় নত হয়, তাঁর ব্যবহার শান্ত ও মহৎ। সৎপথে তিনি চলেন, তাঁর বাক্য বিজ্ঞজনোচিত। কত সূক্ষ্ম ও মহৎ চিন্তায় তাঁর মস্তিষ্ক পূর্ণ— কিন্তু এত জেনেও তিনি কি অতৃপ্ত তত্ত্বানুসন্ধানী নন? অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে তিনিও কি নিয়ত পূত সলিলে, যজ্ঞভূমিতে ব্রাহ্মণদের আলোচনাসভায় এবং গ্রন্থ পাঠ করতে যান না? অনিন্দ্য-চরিত্র তার পিতাকেও কেন প্রতিদিন গোসল করে বিশুদ্ধ হয়ে পাপ ধুয়ে দূর করবার চেষ্টা করতে হবে? তাহলে তাঁর মধ্যে কি আত্মার অস্তিত্ব নেই? আদি কারণ কি তাঁর হৃদয়ের মধ্যে নিহিত নেই? নিজের গভীর সত্তার মধ্যেই তো সবকিছুর মূল কারণ রয়েছে, তাকে জানতে হবে, আয়ত্ত করতে হবে। এ ছাড়া আর যা-কিছু সব হল শুধুই ধোঁকা—গোলকধাঁধা, ভ্রান্তি।

সিদ্ধার্থের এই ছিল ভাবনা; এই ছিল তার আকাঙ্ক্ষা; তার দুঃখ।

সে প্রায়ই আপন মনে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করে : ব্রহ্মাই সত্য। এ-কথা যিনি জানেন প্রতিদিনই তিনি ব্রহ্মালোকে গমন করেন। এই ব্রহ্মালোক অনেক সময় খুব নিকটে মনে হয়, কিন্তু সেখানে সে ঠিক পৌঁছতে পারেনি কখনো, মেটানো হয়নি চরম তৃষ্ণা। সিদ্ধার্থ যেসব পণ্ডিতকে জানে, যাঁদের শিক্ষা তার ভালো লাগে, তাঁদের মধ্যে এমন একজনও নেই যিনি সরাসরি ব্রহ্মালোকে পৌঁছেছেন, কেউ নেই যার অনন্ত তৃষ্ণা পরিপূর্ণরূপে তৃপ্তি পেয়েছে।

সিদ্ধার্থ তার বন্ধুকে বলল, 'গোবিন্দ, চলো বটগাছের ছায়ায় গিয়ে বসি। কিছুক্ষণ ধ্যান করা যাক।'

বটগাছের তলায় এসে বিশ পা ব্যবধানে দুজন বসল। গোবিন্দ 'ওম্' উচ্চারণ করবার উদ্যোগ করতেই সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে আবৃত্তি আরম্ভ করল :

ওম্ হল ধনু; জীবাত্মা তীর এবং ব্রহ্ম হলেন লক্ষ্য। নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারলে তীর ও লক্ষ্যের মিলন ঘটবে। অর্থাৎ জীবাত্মা ব্রহ্মের সাথে একাত্ম হবে।

সাধারণ রীতি অনুযায়ী ধ্যানের সময় উত্তীর্ণ হয়েছে, গোবিন্দ উঠে দাঁড়ায়। এখন সন্ধ্যা। আহ্নিকের সময় হয়েছে। সিদ্ধার্থের নাম ধরে সে ডাকল, কিন্তু সাড়া নেই। সিদ্ধার্থ তন্ময় হয়ে কোনো এক বহুদূর লক্ষ্যের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় জিহ্বার অগ্রভাগ। এমন স্থিরমূর্তি— মনে হয় শ্বাস-প্রশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে। এমনি করেই ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে সিদ্ধার্থ, ভাবছে শুধু : ওম্, আত্মার বাণ নিবদ্ধ করা হয়েছে একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্মের দিকে।

একবার একদল সাধু ঘুরতে ঘুরতে সেই নগরে এসে উপস্থিত হল। তিনজন কৃশকায়, শ্রান্ত ভবঘুরে সন্ন্যাসী; চেহারা থেকে বুঝবার উপায় নেই বৃদ্ধ কি যুবক। তাদের উলঙ্গপ্রায় ধূলিমাখা রক্তাক্ত দেহ সূর্যের উত্তাপে ঝলসে গেছে। এরা নিঃসঙ্গ, অদ্ভুত—সর্বদা যেন মুখ খিঁচিয়েই আছে; মানুষের পৃথিবীতে তারা ক্ষুধার্ত শেয়ালের মতো। তাদের চারপাশে শুধু আকাঙ্ক্ষার পরিবেশ; আত্মা ক্ষয়কারী সেবার ব্রত এবং নির্দয় আত্মনিগ্রহের আদর্শ।

সন্ধ্যায় ধ্যান ভাঙার পর সিদ্ধার্থ গোবিন্দকে বলল, 'শোন বন্ধু, কাল সকালে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেবে; সে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করবে।'

সিদ্ধার্থের কথা শুনে গোবিন্দের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বন্ধুর সংকল্প-কঠিন মুখে সিদ্ধান্তের রেখা পাঠ করল; জ্যা-মুক্ত তীরের মতো তাকে আর ফেরানো যাবে না। বন্ধুর মুখের দিকে চেয়েই গোবিন্দ অনুভব করতে পারল, এবার সিদ্ধার্থের নিজের পথে যাত্রা শুরু হয়েছে, ভাগ্যের পটপরিবর্তন আরম্ভ হল এখন থেকে। সিদ্ধার্থের সঙ্গে গোবিন্দের নিজের জীবনও নতুন পথে যাত্রা করবে। অজানা ভবিষ্যতের আশঙ্কায় গোবিন্দের মুখ শুকনো কলার খোসার মতো বিবর্ণ হয়ে উঠল।

গোবিন্দ বলে উঠল, 'কিন্তু সিদ্ধার্থ, তোমার বাবা কি অনুমতি দেবেন?'

যেন এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে এমনি চোখে সিদ্ধার্থ গোবিন্দের দিকে চাইল। বিদ্যুৎগতিতে সে বুঝতে পারল গোবিন্দের মনোভাব। অনুভব করল তার আশঙ্কা, তার আত্মসমর্পণের ইঙ্গিত।

সে ধীরে ধীরে বলল, "গোবিন্দ, এ বিষয়ে আর বৃথা বাক্য ব্যয় করব না। কাল সকালে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব। এ নিয়ে আর আলোচনা করতে চাই না।"

পিতা যে-ঘরে কুশনের উপরে বসে জপ করছেন সেখানে চলে এল সিদ্ধার্থ। তার উপস্থিতি বুঝতে না-পারা পর্যন্ত সে নীরবে পিতার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একসময় ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে? সিদ্ধার্থ! বলো, কী বলতে চাও।'

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'পিতা, আপনার অনুমতি পেলে গৃহত্যাগ করে কাল আমি সন্ন্যাসীদের দলে যোগ দেব। আমি সন্ন্যাস অবলম্বন করতে চাই। জানি, আপনার অমত হবে না।'

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ নীরবে বসে রইলেন। ঘরের ছোট জানালা দিয়ে দেখা গেল তারার দল রাত্রির আকাশে নতুন নকশা রচনা করছে। পুত্র দুই বাহু বুকের উপর নিবদ্ধ করে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিতা প্রস্তরমূর্তির মতো কুশনের উপর বসে আছেন; বাইরে তারার দল ধীরে ধীরে আকাশের পথ অতিক্রম করে চলছে। বহুক্ষণ পরে পিতা বললেন, 'আমার হৃদয় অসন্তোষে পূর্ণ হয়ে উঠেছে; কিন্তু ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত বাক্য উচ্চারণ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে শোভা পায় না। দ্বিতীয়বার এই অনুরোধ তোমার মুখ থেকে যেন শুনতে না পাই।'

ব্রাহ্মণ আসন ছেড়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থ তখনো তেমনি নীরব, দুহাত বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের জন্য অপেক্ষা করছ?'

বিনীত কণ্ঠে সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'আপনি তা জানেন।'

ব্রাহ্মণ রেগে চলে গেছেন, নিদ্রার সময় হয়েছে। শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল, ঘুম আসে না। ব্রাহ্মণ শয্যাত্যাগ করে কিছুক্ষণ পায়চারি করে ঘরের বাইরে এলেন। ছোট জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন পাশের ঘরে সিদ্ধার্থ তখনো পাথরের মূর্তির ন্যায় বুকের উপর দুই বাহু নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার শাদা কাপড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্ধকার ঘরে। অন্তরে বেদনা বোধ করলেন, ফিরে গেলেন শয্যায়।

আর এক ঘণ্টা গেল; তবু চোখে ঘুম নেই। আবার উঠে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বাইরে এলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। জানালা দিয়ে দেখা পেলেন সিদ্ধার্থ ঠিক তেমনি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; তার পায়ে এসে পড়েছে চাঁদের আলো। ব্রাহ্মণের হৃদয় ব্যথায় ক্লিষ্ট হল, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

এক ঘণ্টা পরে আবার এলেন; আবার দুঘণ্টা পরে। জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন কখনো চন্দ্রালোকে, কখনো তারার আলোয়, কখনো-বা অন্ধকারে সিদ্ধার্থ ঠিক একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি নীরবে এসে জানালা দিয়ে দেখে যান সিদ্ধার্থের নিশ্চল মূর্তি। তাঁর হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হয়ে যায়; মন ভারাক্রান্ত হয় উৎকণ্ঠায়, ভয়ে ও বেদনায়।

রাত্রির শেষ প্রহরে, ভোর হবার আগে, ব্রাহ্মণ আর একবার এলেন, ঘরে ঢুকে দেখলেন পুত্র ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। সে যেন এরই মধ্যে লম্বা হয়ে উঠেছে, এ যেন চিরপরিচিত সিদ্ধার্থ নয়—অন্য কেউ।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিদ্ধার্থ, কেন অপেক্ষা করছ?'

'কেন তা আপনি জানেন।'

'ভোর হবে, দিন গড়িয়ে যাবে দুপুর ও সন্ধ্যায়, তবু কি দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'আমি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করব।'

'সিদ্ধার্থ, তুমি ক্লান্ত হবে।'

'হ্যাঁ, হব।'

'তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, সিদ্ধার্থ।'

'না, ঘুম আসবে না।'

'তোমার মৃত্যু হবে।'

'তা হবে।'

'মৃত্যু কি পিতার আদেশ পালনের চেয়েও বরণীয় তোমার কাছে?'

'সিদ্ধার্থ কোনোদিন পিতার অবাধ্য হয়নি।'

'তাহলে তোমার সংকল্প ত্যাগ কর।'

'পিতা যা আদেশ করবেন সিদ্ধার্থ তাই করবে।'

প্রভাতের প্রথম কিরণ ঘরে প্রবেশ করেছে, ব্রাহ্মণ দেখলেন সিদ্ধার্থের হাঁটু সামান্য একটু কাঁপছে; কিন্তু তার চোখেমুখে দৃঢ়তা। চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে বহুদূরে। পিতা বুঝতে পারলেন, ছেলে এ-বাড়িতে তাঁর সাথে আর থাকতে পারবে না; এর মধ্যেই তাঁকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে।

ব্রাহ্মণ পুত্রের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'বেশ, তুমি বনে যাও, সন্ন্যাস গ্রহণ কর। বনে যদি সেই পরমানন্দ লাভ করতে পার তাহলে আমাকে ভাগ দিয়ে যেও। যদি না পাও, তাহলেও ফিরে এসো; আবার আমরা দুজনে একসঙ্গে দেবতার পূজা করব। এখন যাও, মাকে প্রণাম কর। তাঁকে বলো কোথায় চলেছ। আমার তো প্রাতঃস্নানের সময় হয়েছে, এবার নদীর ঘাটে যাই।'

পুত্রের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ব্রাহ্মণ বাইরে চলে গেলেন। দীর্ঘকাল স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে প্রথম পা ফেলবার উদ্যোগ করতেই সিদ্ধার্থের দেহ দুলে উঠল; নিজেকে সংযত করে পিতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে সে গেল মার সন্ধানে।

ভোরের অন্ধকারে ধীরে ধীরে অসাড় পা ফেলে নিদ্রিত নগরী ত্যাগ করে চলেছে সিদ্ধার্থ। নগরীর শেষ কুটির থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে এল একটি ছায়া, সঙ্গ নিল অভিযাত্রীর। সে ছায়া গোবিন্দের।

মৃদু হেসে সিদ্ধার্থ বলল, 'তুমি এসেছ দেখছি।'

'হ্যাঁ, আমি এলাম', বলল গোবিন্দ।

সাধুদের সাথে

সেদিন বিকেলেই তারা সাধুদের নাগাল পেয়ে গেল। আনুগত্য স্বীকার করে অনুরোধ জানাল দলে ভর্তি করে নিতে। প্রার্থনা মঞ্জুর হল তাদের।

একটি কৌপীন এবং সেলাইবিহীন গেরুয়া রঙের পোশাক রেখে সিদ্ধার্থ তার সকল পোশাক বিলিয়ে দিয়েছে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণকে। দিনে এক বেলা মাত্র খায়, সে খাদ্যেও আবার আগুনের ছোঁয়া লাগবে না। তারপর শুরু হল উপবাস। প্রথম চৌদ্দ দিন; ক্রমে বেড়ে হল আটাশ দিন : গাল থেকে, পা থেকে, মাংস গেল নিশ্চিহ্ন হয়ে সিদ্ধার্থের। বড় বেরিয়ে-আসা চোখে কত অদ্ভুত স্বপ্নের ছায়া ভেসে ওঠে। তার ক্ষীণ আঙুলের নখগুলি দীর্ঘ হয়েছে, চিবুকে দেখা দিয়েছে শুকনো কাঁটা কাঁটা দাড়ি। মেয়েদের সামনে

পড়লে তার দৃষ্টি হয়ে ওঠে বরফের মতো শীতল; সুসজ্জিত নরনারী পূর্ণ নগরের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে তার ঠোঁট অবজ্ঞায় কুঞ্চিত হয়। সিদ্ধার্থ দেখল ব্যবসায়ীরা বেচাকেনা করছে, দেহের পণ্য সাজিয়ে বসে আছে গণিকারা, চিকিৎসা করছে রোগীর, পুরোহিত বীজ বপনের শুভদিন দেখছে, প্রেমিক প্রেম নিবেদন করছে, মা সন্তানকে শান্ত করছে—কিন্তু এসব কোনো দৃশ্য চেয়ে দেখার যোগ্য নয়। কিছুই সত্য নয়— মিথ্যার প্রকট দুর্গন্ধে এরা বিষাক্ত। আনন্দ আর সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের মায়া কেবল। সব একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সংসার বিষময় ঠেকে। জীবন শুধু বেদনা।

সিদ্ধার্থের একটি মাত্র লক্ষ্য—শূন্য হয়ে যাওয়া; তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন, আনন্দ ও বেদনা থেকে মুক্তি পাওয়া; অহংকে মরে যেতে দেওয়া। অহংকে দমন করে নিরাসক্ত হৃদয়ের শান্তি ও বিশুদ্ধ চিন্তার অভিজ্ঞতা অর্জন করা তার একমাত্র লক্ষ্য। অহং যখন পরাজিত ও মৃত, যখন সকল বিক্ষোভ ও আকাঙ্ক্ষা শান্ত হবে, তখন সেই অহংমুক্ত অন্তরে গোপন সত্তা জেগে উঠবে।

প্রখর রৌদ্রে সিদ্ধার্থ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে, কষ্টে ও তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায়; কিন্তু তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে যতক্ষণ না তৃষ্ণা ও বেদনার অনুভূতি লোপ পায়। এমনি করে বৃষ্টিতেও দাঁড়িয়ে থাকে; মাথার চুল থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে কাঁধে; সেখান থেকে কোমর ও পায়ে। ঠাণ্ডায় দেহ জমে যায়; নবীন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে যতক্ষণ-না ঠাণ্ডা গায়ে লাগে, কাঁধ ও পা অনুভূতির বাইরে চলে যায়, প্রবল হিমেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি শীতে জমে না, যতক্ষণ না তারা শান্ত হয়ে পড়ে, স্পর্শানুভূতির বন্ধন থেকে মুক্তি পায়। সিদ্ধার্থ কাঁটার আসনের উপর বসা অভ্যাস করে; ব্যথা—কিছু ছিন্ন চামড়া থেকে রক্ত ঝরে, ঘা হয়; কিন্তু সিদ্ধার্থ অটল শান্তভাবে বসে থাকে। রক্তঝরা বন্ধ না-হওয়া পর্যন্ত, কাঁটাবেঁধার অনুভূতি এবং তার বেদনাবোধ দূর না-হওয়া পর্যন্ত সে আসন ত্যাগ করে না।

সিদ্ধার্থ প্রাণায়াম শুরু করে। ক্রমশ নিঃশ্বাস কম নেওয়া অভ্যাস করতে করতে শ্বাস রুদ্ধ করেও থাকতে পারে অনেকক্ষণ। বাতাস গ্রহণের সময় যাতে হৃৎস্পন্দন বন্ধ থাকে তার সাধনা করতে করতে সে প্রায় সফলতা লাভ করেছে।

বয়োজ্যেষ্ঠ সাধুর উপদেশ অনুসারে সিদ্ধার্থ ধ্যান ও আত্মনিগ্রহ শিক্ষা করে। হয়তো বাঁশবনের উপর দিয়ে যাচ্ছে একটা বক, সিদ্ধার্থের আত্মা গিয়ে প্রবেশ করল তার মধ্যে; কত বন আর পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে এল; বক হয়ে মাছ খেল, বকের ক্ষুধায় কাতর হল। ভাষা ব্যবহার করল বকদের, তারপর মৃত্যু হল বকদের মতোই। বালুকীর্ণ নদীতীরে পড়ে ছিল একটা মরা শেয়াল, সিদ্ধার্থের আত্মা গিয়ে ঢুকল সেই মৃতদেহে। নদীতীরে মরা শেয়াল হয়ে পড়ে রইল সে, ফুলে ছড়াতে লাগল দুর্গন্ধ, পচন শুরু হল, চিতাবাঘ টুকরো টুকরো করল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ঘা খেল শকুনের ধারালো ঠোঁটের, ক্রমে কঙ্কালসার হয়ে পড়ল, তারপর ধূলা হয়ে মিলিয়ে গেল। সিদ্ধার্থের আত্মা ফিরে এল; ফিরে এল মৃত্যু, পচন ও ধূলির মধ্যদিয়ে; ফিরে এল জীবনচক্রের বেদনাময় অভিজ্ঞতা লাভ করে। শিকারির নব নব শিকারের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল এক বিরাট শূন্যতার তীরে, যেখানে

জীবনচক্রের বিবর্তন বন্ধ হয়েছে, যেখানে হেতুবাদ নীরব, যেখানে শুরু হয়েছে বেদনাবোধহীন অনন্ত সত্তা। সে ইন্দ্রিয় দমন করেছে, স্মৃতির সঞ্চয়কে ধ্বংস করেছে, হাজারো বিভিন্ন রূপ নিয়ে নিজের মধ্যথেকে বেরিয়ে এসেছে কতবার। জন্তু, শব, পাথর, কাঠ ও পানির রূপ নিয়েছে সিদ্ধার্থ; আবার প্রত্যেকবার জেগে উঠেছে নিজেদের মধ্যে। জীবনচক্রের দোলায় দুলে সে আবার ফিরে এসেছে আপন সত্তায়। তৃষ্ণা পেয়েছে, দমন করেছে তৃষ্ণা। আবার জেগেছে কোনো নতুন বাসনা।

সাধুদের কাছ থেকে সিদ্ধার্থ অনেক শিখেছে। সত্তাকে লোপ করে দেবার অনেক উপায় জেনেছে। বেদনা দিয়ে আত্মাকে পীড়ন করেছে; পীড়ন করেছে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তি দিয়ে। স্বেচ্ছায় ক্লেশ বরণ করেছে, শিখেছে বেদনা জয় করতে। আবার ধ্যানের পথে সত্তা লোপের চেষ্টা করেছে, মনের আকাশ থেকে সকল ছবি মুছে নিয়ে শূন্যতায় পূর্ণ করতে চেয়েছে মনকে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। এমনি কত পথ সে অবলম্বন করেছে। হাজারো বার সিদ্ধার্থ আপন সত্তাকে হারিয়েছে, দিনের পর দিন আত্মগোপন করেছে বিলীন হওয়ার মাঝে। কী আশ্চর্য এসব প্রক্রিয়া তাকে দূরে নিয়ে গেছে তার সত্তা থেকে। তথাপি শেষপর্যন্ত ফিরে আসতে হয়েছে সেই নিজের মধ্যেই। যদিও বহুবার সিদ্ধার্থ আপন সত্তার কাছে থেকে পালিয়েছে, হারিয়ে গেছে অবিদ্যমানতায়, বাস করেছে জন্তু-পাথরের মধ্যে, তবু তার নিজের মধ্যে ফিরে আসাটা অবশ্যম্ভাবী। সূর্যালোক কিংবা চাঁদের আলোতে, ছায়ায় বা বৃষ্টিতে, কোনো এক মুহূর্তে আবার ফিরে আসবেই, জীবনচক্রের দুর্বিষহ যাতনা আবার জাগিয়ে তুলবে সিদ্ধার্থের নিজস্ব সত্তা।

গোবিন্দ ছায়ার মতো পাশে পাশে থাকে। সে-ও সিদ্ধার্থের মতো সাধনার চেষ্টা করে। যতটুকু বাক্যালাপ অত্যাবশ্যক তা ছাড়া তারা কথা বলত না। কখনো দুজনে গ্রামে যেত নিজেদের ও আচার্যদের জন্য ভিক্ষা করতে।

একদিন ভিক্ষায় বেরিয়ে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, 'গোবিন্দ, তোমার কী মনে হয়? আমরা কি একটুও এগিয়ে যেতে পেরেছি? লক্ষ্যে পৌঁছতে পেরেছি কি?'

গোবিন্দ বলল, 'আমরা শিখেছি অনেক, এখনো শিখছি। তুমি একজন মস্তবড় তপস্বী হবে সিদ্ধার্থ, প্রত্যেক পাঠই তুমি তাড়াতাড়ি শিখে নিয়েছ। সাধুরা প্রায়ই তোমার গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করেন। সিদ্ধার্থ তুমি ঋষিত্ব লাভ করবে।'

সিদ্ধার্থ বলল, 'না বন্ধু আমার তা মনে হয় না। এ পর্যন্ত আমি সন্ন্যাসীর কাছ থেকে যা শিখেছি তা আরো সহজে এবং তাড়াতাড়ি শিখতে পারতাম যে-কোনো পান্থশালায়, গণিকালয়ে, মুটে-মজুর ও পাশা-খেলোয়াড়দের সান্নিধ্যে।'

গোবিন্দ বলল, 'তুমি উপহাস করছ। ওসব হতভাগ্যদের কাছ থেকে তপস্যা ও প্রাণায়াম কী করে শিখতে? ক্ষুধা ও বেদনার অনুভূতিহীনতা জানা কি সম্ভব হত ওদের কাছ থেকে?'

সিদ্ধার্থ মৃদুকণ্ঠে স্বগতোক্তির মতো বলল, 'তপস্যা কী? দেহকে ত্যাগ করার অর্থ কী? উপবাস কিংবা প্রাণায়ামে কী হয়? এগুলো শুধু নিজের কাছ থেকে পালাবার উপায়, অহং-এর যাতনা থেকে সাময়িক পলায়ন। এরা জীবনের পাপ ও বেদনার বিরুদ্ধে ক্ষণস্থায়ী উপশমকারী। এমনি করেই গরুর গাড়ির

গাড়োয়ান জীবন থেকে পলায়নের জন্য কয়েক পাত্র ধেনো-মদ পান করে। তখন সে আর অহংকে অনুভব করে না, ভুলে যায় জীবনের বেদনা। সুরা এনে দেয় সাময়িক পরিত্রাণ। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ দীর্ঘকাল কঠোর সাধনার দ্বারা দেহের বন্ধন থেকে যে সাময়িক পরিত্রাণ লাভ করে, গাড়োয়ান ধেনো-মদের হাঁড়ির উপর ঘুমিয়ে পড়ে ঠিক সেই অনুভূতি পায়।'

গোবিন্দ বলল, 'বন্ধু, এ-কথা বললেও তুমি জানো যে সিদ্ধার্থ গরুর গাড়ির গাড়োয়ান নয়, এবং সাধুরাও মাতাল নয়। সুরার প্রভাবে কিছুক্ষণের জন্য জীবনকে এড়ানো যেতে পারে, হয়তো সত্যি সাময়িক বিরাম ও বিশ্রাম লাভ করা সম্ভব, কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ থেকে ফিরে আসতে হয় দৈনন্দিন জীবনের অপরিবর্তনীয় পৃথিবীতে। এ উপায়ে জ্ঞান বাড়ে না, নতুন বিদ্যা শেখা হয় না, জীবনের সিঁড়ি বেয়ে একধাপ উপরে ওঠা সম্ভব নয়।'

একটু হেসে সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'আমি জানি না। কোনোদিন তো মদ খাইনি। কিন্তু আমি এই সিদ্ধার্থ যে তপস্যা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের দ্বারা শুধু ক্ষণকালের পরিত্রাণ পাই জীবন থেকে; জ্ঞান ও মোক্ষ যে গর্ভস্থ ভ্রূণের মতোই দূরের জিনিস আমার কাছে, গোবিন্দ, এ-কথা আমি জানি।'

আর একবার তাদের সহকর্মী ও গুরুদের জন্য ভিক্ষায় বেরিয়ে দুজনে এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ শুরু করল। সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, 'গোবিন্দ, আমরা কি ঠিক পথে চলেছি? কী জ্ঞান লাভ করেছি আমরা? মোক্ষ লাভের দিকে এগিয়ে চলেছি কি? অথবা যে চক্র থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাড়িঘর ত্যাগ করেছি, সেই চক্রেই ঘুরে মরছি?'

গোবিন্দ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমরা অনেক শিখেছি, সিদ্ধার্থ। আরো কত শেখার আছে! গোলকধাঁধা থেকে আমরা বেরিয়ে এসেছি, উপরের দিকে উঠছি। পথ ঊর্ধ্বে উঠেছে ঘুরে ঘুরে, এর মধ্যেই অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙেছি আমরা।'

সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল, 'আমাদের শ্রদ্ধেয় বয়োজ্যেষ্ঠ আচার্যের বয়স কত বলতে পার?'

'তাঁর বয়স প্রায় ষাট বছর।'

সিদ্ধার্থ বলল, 'ষাট বছর বয়সেও তিনি নির্বাণ লাভ করতে পারেননি। তাঁর বয়স হবে সত্তর, সত্তর থেকে গড়িয়ে যাবে আশিতে, আমরাও তাঁর মতো বৃদ্ধ হব, কত অনুষ্ঠান, উপবাস ও তপস্যা করব, কিন্তু আমরা নির্বাণ লাভ করব না, তিনিও না, আমরাও না। গোবিন্দ, আমার ধারণা যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনও বোধহয় নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। আমরা শুধু কতকগুলি ছলচাতুরি শিখেছি; তা দিয়ে নিজেদের প্রতারিত করি, কখনো-বা একটু সান্ত্বনা পাই, কিন্তু আসল জিনিসের সন্ধান এখনো পাইনি। বলো, যার জন্য এত আয়োজন, এত ধ্যান-ধারণা, সেই পথের সন্ধান কে পেয়েছে?'

গোবিন্দ যেন বাধা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না, এমন ভয়ঙ্কর কথা তুমি বোলো না, সিদ্ধার্থ। এই যে এত পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, কঠোরব্রতী শ্রমণ, সাধু-সন্ন্যাসী এবং জিজ্ঞাসু, যাঁরা একান্তচিত্তে অন্তরদেবতার সাধনা করছেন, তাঁরা কি কেউ পথ খুঁজে পাবেন না?'

সিদ্ধার্থ কণ্ঠে বিদ্রূপ ও বেদনা মিশিয়ে উত্তর দিল, 'গোবিন্দ, তোমার বন্ধু এতদিন যে পথে তোমাকে সাথে নিয়ে চলেছে সে পথ সত্বর তাকে ছাড়তে হবে। গোবিন্দ, আমার অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক তৃষ্ণার জ্বালা; সন্ন্যাসীদের পথ অনুসরণ করে সে তৃষ্ণা একটুও তৃপ্ত হয়নি ; জ্ঞানের তৃষ্ণা সর্বদা আমাকে ব্যাকুল করে, কত অসংখ্য প্রশ্নে আমার মন সর্বদা পূর্ণ। বছরের পর বছর আমি ব্রাহ্মণদের প্রশ্ন করেছি, পবিত্র বেদের মধ্যে দিনের পর দিন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। হয়তো বনের গণ্ডার কিংবা বনমানুষকে প্রশ্ন করলেও ঠিক এমনি পুণ্যের ও বুদ্ধিমানের কাজ হত। গোবিন্দ, একটি কথা জানার জন্য আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি : তা হল এই যে, আমরা কিছুই শিখতে পারি না ; আমার মনে হয়, প্রত্যেক বস্তুর মূল সত্তায় এমন কিছু রয়েছে যার জ্ঞানলাভ অসম্ভব। আমার ও তোমার মধ্যে, সব জীবে এবং সর্বত্র আমরা পরমাত্মার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারি; আত্মার স্বরূপ তো তাতে শেখা যায় না। আমার বিশ্বাস, জ্ঞানের সবচেয়ে বড় শত্রু হল পণ্ডিত ব্যক্তি এবং পাণ্ডিত্য।'

গোবিন্দ পথের উপর দাঁড়িয়ে হাত তুলে বলল, 'এসব বলে বন্ধুকে দুঃখ দিও না। সত্যি বলছি, তোমার কথা আমাকে বেদনা দেয়। তোমার কথাই যদি সত্যি হত, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য যদি না থাকত, তবে ভেবে দেখ, পবিত্র আরাধনা ব্যর্থ হয়ে পড়ত, ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধার মূল কারণটাও দূর হয়ে যেত। সিদ্ধার্থ, জ্ঞান যদি সত্য না হয় তাহলে সংসারে মূল্য যাচাই করব কী দিয়ে? পৃথিবীতে পবিত্র কী, কোন্ জিনিস মূল্যবান এবং শ্রদ্ধার যোগ্য তা বাছাই করব কোন্ উপায়ে?'

অনেকটা যেন নিজ বক্তব্যের সমর্থনে গোবিন্দ গুনগুন করে উপনিষদের একটি শ্লোক আবৃত্তি করল :

আত্মায় শুচিশুভ্র মন যার ডুবেছে
সেই পায় সুখের সন্ধান যা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব।

সিদ্ধার্থ অনেকক্ষণ ধরে নীরবে বিচার করল গোবিন্দের কথাগুলো। নতমস্তকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ ভাবল : হ্যাঁ, সত্যি তো। যা কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করি তার কী থাকে? কী অবশিষ্ট থাকে? কী বাকি থাকে? মাথা ঝাঁকাল সিদ্ধার্থ।

একে একে দুই বন্ধুর সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যে যখন প্রায় তিন বছর কেটে গেল, তখন নানা জায়গায় নানা লোকের মুখ থেকে একটা জনশ্রুতি তাদের কানে আসতে লাগল : গৌতমবুদ্ধ নামে একজন মহাত্মার আবির্ভাব হয়েছে। তিনি জয় করেছেন পৃথিবীর সকল দুঃখ, এবং রুদ্ধ করে দিয়েছেন জীবন-মৃত্যুর চক্রাকার গতি। তিনি শিষ্যপরিবৃত হয়ে ধর্মোপদেশ দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন দেশের সর্বত্র। তাঁর সম্পত্তি নেই, গৃহ নেই, নেই সংসার, পরিধানে সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক, কিন্তু উন্নতললাট সেই মহাত্মার পদতলে কত রাজা, কত ব্রাহ্মণ লুটিয়ে পড়ে, গ্রহণ করে শিষ্যত্ব।

এই জনশ্রুতি, এই কাহিনী, ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। নগরে ব্রাহ্মণরা এই কথা নিয়ে আলোচনা করে, সাধুরা করে বনে। দুই তরুণবন্ধুর কানে অবিরাম গৌতমবুদ্ধের নাম এসে পৌঁছায়। সে নাম কখনো নিন্দায় মলিন, কখনো-বা প্রশংসায় উজ্জ্বল।

কোনো দেশ যখন মহামারীর আক্রমণে উৎসন্নে যাবার মুখে পড়ে, তখন প্রায়ই জনশ্রুতি শোনা যায় যে, এমন একজন বিজ্ঞ মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে যাঁর ফুঁকে ও বাণীতে রোগী নিরাময় হয়। এই কাহিনী দ্রুত দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, অনেকে বিশ্বাস করে, অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করে। কত লোক শোনামাত্র ছুটে যায় মহাপুরুষের সন্ধানে। ঠিক তেমনি শাক্যকুলের গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের সুসংবাদ দেশের সর্বত্র প্রচারিত। ভক্তরা বলে, তাঁর জ্ঞান প্রগাঢ়, তিনি পূর্ব জীবনকে স্মরণ করেন, তিনি নির্বাণের মন্ত্রগুলো আয়ত্ত করেছেন। জন্ম-মৃত্যুর বিবর্তন আর তাঁকে স্পর্শ করবে না, জন্মে জন্মে বিভিন্ন জীবনের আকার গ্রহণ করতে হবে না। আকারের উত্তাল স্রোতে আর ডুব দেবার ও মৃত্যুর পরে নতুন দেহাবয়ব গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। অনেক বিস্ময়কর অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনা যায় তাঁর সম্বন্ধে। তিনি অসাধ্য সাধন করেছেন, শয়তানকে জয় করেছেন, দেবতাদের সাথে কথা বলেছেন। কিন্তু তাঁর শত্রু এবং সন্দেহবাদীরা বলে, গৌতম প্রতারক; বিলাসের মধ্যে তাঁর দিন কাটে, বিদ্যা নেই, জানা নেই তপস্যার রীতিনীতি আর দৈহিক কামনাকে শাসনের উপায়।

বুদ্ধ সম্বন্ধে জনশ্রুতির মধ্যে কী যেন আকর্ষণ ছিল; এই কাহিনীতে বুঝি কী জাদু ছিল! পীড়িত পৃথিবীর কঠোর জীবনে দেখা দিল নতুন আশা; শোনা গেল নতুন আশার বাণী—যে বাণীতে আছে শান্তি ও সান্ত্বনা, আর আছে ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট সম্ভাবনা। সর্বত্র সকল লোকের মুখে-মুখে বুদ্ধের কথা। ভারতবর্ষের সবখানে তরুণরা তাঁর কথা শোনে; তাদের হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায় নতুন আশায়, অজানা আকাঙ্ক্ষায়। কি গ্রামে, কি নগরে, সর্বত্র তীর্থযাত্রী ও বিদেশীদের সমাদরে আপ্যায়িত করা হত, যদি তাদের কাছে থাকত শাক্যমুনির কোনো সংবাদ।

জনশ্রুতি এসে পৌঁছল বনবাসী সন্ন্যাসীদের কানে। সিদ্ধার্থ এবং গোবিন্দও শুনতে পায় টুকরো-টুকরো খবর। প্রতিটি সংবাদ আশায় উজ্জ্বল, সন্দেহে ভারাক্রান্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী বুদ্ধ-কথা পছন্দ করেন না। সুতরাং দুই বন্ধুর এ-কথা নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ নেই। তিনি শুনেছেন বুদ্ধ প্রথম সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনবাসী হয়েছিলেন; ফিরে এসে মগ্ন হয়েছেন বিলাসে, যে গৌতমের জীবনের ইতিহাস এই, তাঁর কথা শুনবার আগ্রহ নেই সন্ন্যাসীর।

একদিন গোবিন্দ সিদ্ধার্থকে বলল, 'আজ আমি গ্রামে গিয়েছিলাম; এক ব্রাহ্মণ আমাকে আমন্ত্রণ করলেন তাঁর গৃহে। সেই বাড়িতে দেখা হল এক ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে। সে এসেছে মগধ থেকে, নিজের চোখে দেখেছে বুদ্ধকে, শুনেছে তাঁর উপদেশ। আমার মনে আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল, ভাবলাম, আমরাও যদি যেতে পারতাম তার সাথে! সিদ্ধার্থ, চলো আমরাও শুনে আসি বুদ্ধের উপদেশ।'

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'আমি তো ভেবেছি গোবিন্দ চিরদিনই সাধুদের সঙ্গে থাকবে; সাধুর কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা সে অভ্যাস করে যাবে ৬০ এবং ৭০ বছর বয়স পর্যন্ত। কিন্তু গোবিন্দকে আমি কতটুকু জানতাম! তার হৃদয়ের কথা! এখন দেখছি তুমি নতুন পথ গ্রহণ করতে চাও, যেতে চাও বুদ্ধের উপদেশ শুনতে।'

গোবিন্দ বলল, 'আমাকে বিদ্রূপ করে তুমি কৌতুক অনুভব করতে চাও, করো; তাতে আমার কিছু যায় আসে না। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তাঁর উপদেশ শোনবার জন্য আমারও কি আগ্রহ হতে পারে না? সন্ন্যাসীদের সঙ্গে যে বেশিদিন থাকবে না, এ-কথা তো তুমিও বলেছ আমাকে।'

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল। সে হাসিতে মেশানো ছিল বিদ্রূপ ও বেদনার প্রচ্ছন্ন সুর। বলল, 'বেশ বলেছ, গোবিন্দ; তুমি তো দেখছি আমার কথাগুলো বেশ মনে করে রেখেছ; আশা করি আরও যা কিছু বলছি তা-ও ভুলে যাওনি। আমি বলেছিলাম, বিদ্যা এবং উপদেশে আস্থা হারিয়ে ফেলেছি, গুরুবাক্যে আর বিশ্বাস নেই। যা হোক, নতুন উপদেশ শুনতে যাবার জন্য আমিও প্রস্তুত। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এই নতুন শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফলের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচয় হয়েছে।'

গোবিন্দ উত্তর দিল, 'তোমার সম্মতি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু গৌতমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পূর্বেই তাঁর শিক্ষার পরিচয় কী করে আমরা পেয়েছি তা বুঝিয়ে বল।'

সিদ্ধার্থ বলল, 'গোবিন্দ, গৌতমের শিক্ষার যে ফল পেয়েছি আগে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যাক। তাঁর উপদেশ আমাদের প্রলুব্ধ করে শ্রমণদের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে ভালো অন্য কী ফল পাওয়া যাবে, তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে।'

সেদিনই সিদ্ধার্থ বয়োবৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে তাদের চলে যাবার সিদ্ধান্ত জানাতে গেল। বিনয় ও সৌজন্যের সঙ্গে কথা বলল সিদ্ধার্থ; কিন্তু দুজনে 'চলে যাব' শুনে বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, কঠোর ভাষায় তিরস্কার করলেন তাদের।

গোবিন্দ একটু ভয় পেয়ে গেল, কিন্তু তার কানে চুপিচুপি সিদ্ধার্থ বলল, 'এই বৃদ্ধের কাছে-যে কিছু শিখেছি, আজ তার একটু পরিচয় দিয়ে যাব।'

সিদ্ধার্থ একাগ্রমনে গিয়ে দাঁড়াল সন্ন্যাসীর সামনে; তাঁর চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দৃষ্টি দিয়ে বন্দি করে ফেলল বৃদ্ধকে। সন্ন্যাসী সম্মোহিত হয়ে পড়লেন, তাঁর ইচ্ছা লোপ পেল, কথা হারিয়ে গেল। সিদ্ধার্থ তাঁকে নির্দেশ দিল নীরবে আদেশ পালন করতে। বৃদ্ধের মুখে কথা নেই, চোখ কাচের মতো চকচক করছে, দেহ গেছে অসাড় হয়ে; দুই বাহু ঝুলে পড়েছে; সিদ্ধার্থের জাদু তাঁকে শক্তিহীন করেছে। সিদ্ধার্থ জয় করেছে সাধুর চিন্তা; তার আদেশ পালন না করে উপায় নেই। বৃদ্ধ কয়েকবার অভিবাদন করে আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন এবং থেমে থেমে জানালেন শুভযাত্রার কামনা। দুই বন্ধু আশীর্বাদের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

পথ চলতে চলতে গোবিন্দ বলল, 'সিদ্ধার্থ, আমার যা ধারণা ছিল সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি শিখে নিয়েছ। একজন বৃদ্ধ সাধুকে এভাবে সম্মোহিত করতে পারা সহজ নয়, অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমার মনে হয়, এখানে থাকলে তুমি নিশ্চয়ই পানির উপর দিয়ে হাঁটবার কৌশলও শিগগির শিখতে পারতে।'

'পানির উপর হাঁটবার আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।' সিদ্ধার্থ উত্তর দিল। 'এসব চাতুরি নিয়ে বুড়ো সাধুরাই সন্তুষ্ট থাকুক।'

গৌতম বুদ্ধের সান্নিধ্যে

শাবন্তী নগরের প্রত্যেকে বুদ্ধের নামের সাথে পরিচিত। গৌতমের ভিক্ষার্থী শিষ্য নীরবে যে-বাড়ির সামনেই এসে দাঁড়াক, ভিক্ষাপাত্র তক্ষুণি পূর্ণ হয়ে যায়। নগরের নিকটে জেতাবন উদ্যান বুদ্ধের প্রিয় বাসস্থান। বুদ্ধের অত্যন্ত অনুরক্ত ভক্ত ধনী বণিক অনাথপিণ্ডদ এই জেতাবন গৌতম ও তাঁর শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য উৎসর্গ করেছেন।

গৌতমের খোঁজ করতে করতে দুই বন্ধু এসে পৌঁছল শাবন্তী নগরে। লোকের পর লোককে প্রশ্ন করে, জনশ্রুতি শুনে শুনে তারা পথ চলেছে। শাবন্তীর যে-বাড়ির সামনে তারা প্রথম এসে ভিক্ষার জন্য দাঁড়াল, মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই সে বাড়ির গৃহিণী তাদের খাবার এনে দিল। আহার শেষ করে সিদ্ধার্থ কর্ত্রীকে বলল : 'বুদ্ধের ঠিকানা যদি আমাদের দয়া করে বলে দেন তাহলে বিশেষ উপকৃত হব। তাঁকে দেখব এবং তাঁর নিজের মুখ থেকে উপদেশ শুনব বলে আমরা দুজন শ্রমণ বন থেকে এসেছি।'

মহিলা বললেন, 'হে অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, আপনারা ঠিক জায়গায় এসেছেন : বুদ্ধদেব এখন কিছুদিনের জন্য জেতাবন উদ্যানে বাস করবেন। প্রকাণ্ড উদ্যানে দেশ-দেশান্তর থেকে আগত বুদ্ধের উপদেশ শোনার অভিলাষী হাজার হাজার লোকের আশ্রয় পাবার মতো যথেষ্ট স্থান আছে। আপনারাও আজকের রাতটা সেখানে গিয়ে কাটান।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে গোবিন্দ বলল, 'বাহ্ তাহলে তো লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছি আমরা; আমাদের সফর এবার শেষ হল। কিন্তু বলুন তো, আপনি কি বুদ্ধকে দেখেছেন? দেখেছেন তাঁকে নিজের চোখে?'

মহিলা উত্তর দিলেন, 'অনেকবার দেখেছি। কতদিন তাঁকে রাস্তা দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যেতে দেখেছি; পরনে গেরুয়া বসন, নীরবে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিয়েছেন দুয়ারে দুয়ারে, তারপর পূর্ণ পাত্র নিয়ে ফিরে গেছেন জেতাবনে।'

গোবিন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগল বুদ্ধের কথা। আরো প্রশ্ন করে তাঁর সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু শুনবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু সিদ্ধার্থ স্মরণ করিয়ে দিল, যাবার সময় হয়েছে। দুজনে কর্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল।

পথ জেনে নেবার দরকার নেই। পথ দিয়ে চলেছে কত পর্যটক; বৌদ্ধভিক্ষুও আছে তাদের মধ্যে। সকলের লক্ষ্য জেতাবন। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ সেই জনস্রোতে মিশে গেল : রাতে তারা যখন জেতাবনে পৌঁছল তখনো অবিরাম আসছে অতিথির দল। সমবেত বিপুল জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে আশ্রয়ের প্রার্থনা এবং আশ্রয় লাভ করে কৃতজ্ঞতা দুই বন্ধু আশ্রয় পেল সহজেই; বনবাসে তারা অভ্যস্ত, তাদের কোনো অসুবিধাই হল না।

ভোর হল। সিদ্ধার্থ ও গোবিন্দ বিস্মিত হয়ে গেল উদ্যানের চারদিকে দেখে : বিপুলসংখ্যক ভক্ত ও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি সেখানে রাত কাটিয়েছে। সেই চমৎকার

উদ্যানের পথে পথে গেরুয়াধারী ভিক্ষুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখানে-সেখানে গাছের নিচে কেউ-বা ধ্যানমগ্ন; কেউ কেউ আবার দল বেঁধে আধ্যাত্মিক আলোচনায় মত্ত। সেই ছায়াময় উদ্যান যেন একটি অভিনব নগর আর তার নাগরিকরা যেন কয়েক ঝাঁক মৌমাছি। অধিকাংশ ভিক্ষুই একে একে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে উদ্যান ত্যাগ করল; দুপুরের খাবার সংগ্রহ করতে হবে—সারাদিনে ঐ একবার মাত্র আহার। বুদ্ধ নিজেও প্রাতঃকালে ভিক্ষায় বের হতেন।

সিদ্ধার্থ দেখতে পেল তাঁকে, আর তৎক্ষণাৎ চিনতে পারল— যেন কোনো এক দেবতা চিনিয়ে দিলেন। দেখল, বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র হাতে ধীরে ধীরে উদ্যান ত্যাগ করছেন; তাঁর পরিধানে গেরুয়া বসন; মুখে নিরহঙ্কার, বিনয়নম্র প্রশান্তি।

গোবিন্দের কানে কানে বলল সিদ্ধার্থ : 'দেখ, এই যে বুদ্ধ যাচ্ছেন।'

গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীকে গভীর আগ্রহে লক্ষ করতে লাগল গোবিন্দ। শত শত ভিক্ষুর মধ্যে আলাদা করা যেতে পারে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য সহসা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না; তবু সহজে চিনতে পারল গোবিন্দ; হ্যাঁ, এ-ই বুদ্ধ; দুই বন্ধু পিছু পিছু তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

চিন্তামগ্ন বুদ্ধ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর শান্ত মুখমণ্ডলে ছিল না সুখ কিংবা দুঃখের রেখা। তাঁর অন্তরে বুঝি একটি মৃদু হাসির উৎস আছে। এই গোপন হাসির উৎস নিয়ে তিনি নীরবে প্রশান্ত মনে হেঁটে চলেছেন। অন্য ভিক্ষুদের মতোই তিনি গেরুয়া বসন পরিধান করে ভিক্ষায় বেরিয়েছেন, কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল এবং পদক্ষেপ শান্ত, নত দৃষ্টি; ঝুলে পড়া দুই বাহু এবং তাদের প্রতিটি আঙুল যেন শান্তির বাণী ঘোষণা করছে, বলছে পূর্ণতা ও অনাসক্তির কথা, যেন প্রতিফলিত হচ্ছে এক অব্যাহত, অখণ্ড—একটি উজ্জ্বল জ্যোতিশিখা।

গৌতম ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরের পথে পথে ঘুরছেন। দুই নবীন সন্ন্যাসী মুগ্ধ হয়েছে তাঁর শান্ত আচরণ দেখে, তাঁর অচঞ্চল দেহের লাবণ্যে—যে দেহে আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা, কপটতা বা উদ্যমের চিহ্ন নেই; আছে শুধু অপূর্ব জ্যোতি ও মনোরম প্রশান্তি।

অনেকটা আপন মনেই বলল গোবিন্দ : 'আজ তার মুখ থেকে উপদেশ শুনতে পাব।'

সিদ্ধার্থ কিছুই বলল না। উপদেশ সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল নেই। উপদেশ থেকে নতুন কিছু শিখবে এমন আশা সে করে না। সরাসরি না হলেও অন্য লোকের মুখ থেকে তারা জেনেছে বুদ্ধের উপদেশের সারমর্ম। গোবিন্দ গভীর আগ্রহে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে বুদ্ধের মাথায়, কাঁধে ও ঝুলে-পড়া স্থির বাহুর উপরে। তাঁর হাতের আঙুলের প্রতিটি সন্ধি থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে বাঙময় জীবন্ত জ্ঞানধারা, বিকীর্ণ হচ্ছে সত্যের দীপ্তি। এই লোকটিই বুদ্ধ, প্রকৃতই ধার্মিক; কোনো ফাঁকি নেই। সিদ্ধার্থ এত শ্রদ্ধা কখনো কাউকে করেনি, এমন করে কাউকে আর ভালোবাসেনি।

দুই বন্ধু নীরবে বুদ্ধের সাথে নগর পরিক্রমণ শেষে তাঁর পিছু পিছু জেতাবনে ফিরে এল। বুদ্ধ উদ্যানে ফিরে এসে শিষ্য-পরিবৃত হয়ে খেতে বসলেন। আহার্যের পরিমাণ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সিদ্ধার্থ। একটা পাখিকেও এর চেয়ে বেশি খেতে হয়। খাওয়া শেষে বুদ্ধ আমগাছের ছায়ায় গিয়ে বসলেন।

বিকেলবেলা; দিনের গরম হ্রাস পেয়েছে। আশ্রমের সবাই এসে মিলিত হল উপদেশ শুনতে। গোবিন্দ ও সিদ্ধার্থ প্রথম সুযোগ পেল বুদ্ধের কণ্ঠস্বর শোনার। নিটোল, পরিপূর্ণ স্বর; শান্ত এবং শান্তির প্রলেপ মাখানো। গৌতম বললেন দুঃখ সম্বন্ধে; দুঃখের কারণ এবং তার হাত থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে আলোচনা করলেন। জীবন শুধু বেদনা, সংসার দুঃখে পূর্ণ; কিন্তু দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় আছে। মুক্তি পাওয়া যাবে বুদ্ধের পথ অনুসরণ করলে।

মৃদু কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে বুদ্ধ ধর্মচক্র শিক্ষা দিলেন, ব্যাখ্যা করলেন আষ্টামিক আর্যমার্গের। উদাহরণের সাহায্য এবং এক বিষয় বারবার বলে বক্তব্য স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। বারবার বলতে গিয়ে তাঁর ক্লান্তি নেই; এভাবে উপদেশ দেওয়াই তাঁর অভ্যাস। তাঁর কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মনে পরিষ্কারভাবে পৌঁছে দিল উপদেশ— পৌঁছে দিল আলোকরশ্মির মতো, আকাশের নক্ষত্রের মতো।

বুদ্ধের আলোচনা শেষ হতে রাত হয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতাদের থেকে অনেকে এল এগিয়ে, অনুরোধ করল তাদেরকে দলভুক্ত করে নিতে। বুদ্ধ তাদের গ্রহণ করলেন; বললেন, 'তোমরা বেশ মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছ; আমাদের সাথে যোগ দিয়ে দুঃখকে জয় করো, যাত্রা শুরু করো চরম আনন্দের পথে।'

লাজুক গোবিন্দ সামনে সরে এল। বলল, 'আমিও ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে চাই।' তার আবেদন গৃহীত হল; আনন্দে ভরে উঠল গোবিন্দের বুক।

রাতের বিশ্রামের জন্য বুদ্ধ চলে গেলে গোবিন্দ সিদ্ধার্থের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলল, 'সিদ্ধার্থ, তোমাকে তিরস্কার করা আমার শোভা পায় না। আমরা দুজনেই তাঁর উপদেশ শুনেছি, আমি দীক্ষা নিয়েছি এই নবধর্মের। কিন্তু বন্ধু, তুমিও কি আসবে না মুক্তির পথে? তুমি কি বিলম্ব করবে, এখনো অপেক্ষা করে থাকবে?'

সিদ্ধার্থ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল গোবিন্দর মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'গোবিন্দ, বন্ধু, তুমি নতুন পথে পা দিয়েছ, বেছে নিয়েছ তোমার পথ। তুমি আমার আজন্মের বন্ধু, তবু চিরদিন চলেছ আমার পিছে পিছে। কতবার আমি ভেবেছি : আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করে গোবিন্দ আমাকে ছাড়া একা পথ চলতে শিখবে কবে? এই তো দেখছি, এখন তুমি সাবালক হয়েছ এবং নিজের পথ খুঁজে নিয়েছ। এই পথের শেষ পর্যন্ত দেখবে বলে আশা করি। তুমি মোক্ষ লাভ করো— এই আমার কামনা।'

গোবিন্দ যেন সিদ্ধার্থের কথার মর্ম বুঝতে না পেরে অধৈর্য হয়ে পূর্ব প্রশ্নের

পুনরাবৃত্তি করল : 'বুদ্ধদেবের আনুগত্য স্বীকার না করে উপায় নেই, সে-কথা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই; বলো।'

গোবিন্দের কাঁধে হাত রেখে সিদ্ধার্থ বলল, 'তুমি তো আমার শুভকামনা শুনেছ। আবার বলছি। নতুন পথের শেষ পর্যন্ত যেন যেতে পার; যেন মোক্ষলাভ করতে পার।' গোবিন্দ হঠাৎ বুঝতে পারল বন্ধু তাকে ছেড়ে যাচ্ছে। তার সংযমের বাঁধ ভেঙে গেল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'সিদ্ধার্থ!'

সিদ্ধার্থ বড় মমতার সঙ্গে ধীরে ধীরে বলল, 'গোবিন্দ, ভুলে যেও না তুমি এখন বৌদ্ধভিক্ষুদের একজন। তুমি গৃহত্যাগ করেছ, পিতা-মাতাকে ছেড়ে এসেছ; বংশ-পরিচয় ও সম্পত্তি, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও বন্ধুত্ব—সবকিছু তুমি ত্যাগ করেছ; বুদ্ধের উপদেশও তাই। এতদিন তুমিও এই চেয়েছ। গোবিন্দ, কাল সকালে আমি তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।'

অনেকক্ষণ ধরে দুই বন্ধু উদ্যানে ঘুরে বেড়াল। তারপর তারা শুয়ে পড়ল, কিন্তু কারো চোখেই ঘুম নেই। গোবিন্দ বন্ধুর কাছ থেকে বারবার জানতে চায় সে কেন বুদ্ধের অনুগামী হবে না, তাঁর শিক্ষায় কী ত্রুটি আছে। কিন্তু পীড়াপীড়িতে ফল হল না। সিদ্ধার্থ শুধু একটি উত্তরই দেয় : 'তুমি নিশ্চিন্ত হও, গোবিন্দ! তথাগতের শিক্ষা অতি উত্তম। তার ত্রুটি আমি বের করব কী করে?'

পরদিন ভোরে একজন বৌদ্ধভিক্ষু উদ্যানে ঘুরে ঘুরে নবদীক্ষিতদের ডাকলেন তাঁর কাছে। তাদের হাতে তুলে দিলেন বৌদ্ধ-শ্রমণের গৈরিক বস্ত্র এবং শিখিয়ে দিলেন বুদ্ধ-শিষ্যের কর্তব্য। গোবিন্দ বাল্যবন্ধুকে শেষবারের মতো আলিঙ্গন করল, সিদ্ধার্থের স্পর্শ থেকে নিজেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এল; তারপর নতুন গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে যেন আরো দূরে সরে গেল।

সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে ঘুরতে ঘুরতে গৌতমের সামনে এসে পড়ল। কী প্রশান্তি, কী করুণা বুদ্ধের মুখমণ্ডলে! মুগ্ধ হল সিদ্ধার্থ। ভক্তিভরে প্রণাম করে অনুমতি চাইল তাঁর সাথে কয়েকটি কথা বলবার। বুদ্ধ নীরবে সম্মতি জানালেন।

সিদ্ধার্থ বলল, 'কাল আপনার আশ্চর্য উপদেশ আমার শুনবার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেক দূর থেকে আমরা দুই বন্ধু আপনার উপদেশ শুনতে এসেছিলাম; বন্ধু আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে, এখানেই থেকে যাবে। আমি আবার যাত্রা শুরু করব নতুন কোনো তীর্থের পথে।'

মধুর কণ্ঠে বুদ্ধ বললেন, 'যেমন তোমার ইচ্ছা।'

সিদ্ধার্থ আবার বলল, 'এটা আমার ধৃষ্টতা, তবু মনে যে-প্রশ্নগুলো জেগেছে তা আপনাকে না জানিয়ে যেতে পারছি না। দয়া করে একটু শুনবেন আমার কথা?'

বুদ্ধ পূর্বের মতো নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।

সিদ্ধার্থ বলল, 'হে মহান, আপনার উপদেশ আমাকে প্রধানত মুগ্ধ করে একটি কারণে। আপনি যা-কিছু বলেন সব সম্পূর্ণ স্পষ্ট, প্রমাণের দ্বারা

সমর্থিত। আপনি দেখিয়েছেন যে এই জগৎ একটি কার্যকারণের অনন্ত শৃঙ্খল; এমন সুন্দর করে আর কেউ এ-কথাটি ব্যাখ্যা করতে পারেনি; এমন অকাট্য প্রমাণও আর কেউ দিতে পারেনি। আপনার শিক্ষার আলো দিয়ে ব্রাহ্মণরা যখন জগৎকে নতুন করে দেখবে তখন নিশ্চয়ই তাদের হৃৎকম্প শুরু হবে। তারা বুঝবে জগৎ আকস্মিকতার কিংবা দেবতাদের করুণার ওপর নির্ভরশীল নয়; জগতের সকল ঘটনাই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সে সম্পর্কে কোনো ফাঁক নেই; আর নেই অস্পষ্টতা, সব স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। জীবন শুধু আনন্দ অথবা বেদনা, নিত্য কি অনিত্য, শুভ কিংবা অশুভ— এসব প্রশ্ন আপনার শিক্ষায় প্রাধান্য লাভ করেনি। হে দেবর্ষি, আপনার মহান উপদেশে বড় করে দেখানো হয়েছে জগতের ঐক্যবোধকে। জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত, কেউ বিচ্ছিন্ন নয়, সকলের মূলে আছে এক আদি কারণ। জীবন ও মৃত্যু এবং ছোটবড় প্রত্যেকটি ঘটনা নিয়ে প্রবহমান নদীর মতো বয়ে চলেছে এই জগৎ; কোনোকিছুরই পৃথক সত্তা নেই, সব এক ও অভিন্ন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই অখণ্ড রূপ আপনার কাছ থেকে যেমন স্পষ্ট উপলব্ধি করেছি, এমন আর কোথাও পাইনি। কিন্তু এক জায়গায় এই অখণ্ডতার আদর্শ ব্যাহত হয়েছে। একটি ছোট ছিদ্র দিয়ে যেন ঐক্যানুভূতির জগতে প্রবেশ করল এমন কিছু যার প্রমাণ নেই, যা সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিচিত। সংসারের ঊর্ধ্বে উঠবার এবং নির্বাণ লাভ সম্বন্ধে আপনার মতবাদ আকস্মিক এবং খাপছাড়া মনে হয়। এই ছোট ফাঁকটুকুর জন্য আপনার অখণ্ড জগতের আদর্শ ভেঙে পড়েছে; অখণ্ড জগতের চিরন্তন বিধিটাও আর একবার ভেঙে পড়ল। বিরুদ্ধ সমালোচনা করছি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন।'

গৌতম স্থির হয়ে নীরবে শুনলেন সিদ্ধার্থের কথা। তারপর প্রসন্নকণ্ঠে স্পষ্ট করে বললেন, 'হে ব্রাহ্মণকুমার, তুমি আমার উপদেশ ভালো করেই শুনেছ। যে গভীর মনোযোগসহকারে তুমি চিন্তা করেছ তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য! তুমি একটা ত্রুটি পেয়েছ। আর একবার উত্তমরূপে ভেবে দেখো। তোমার মতো জ্ঞানপিপাসুদের আমি কথার হেঁয়ালি এবং অসংখ্য মতবাদের আগাছা থেকে সাবধান করে দিতে চাই। আমাদের মতামতের কোনো মূল্য নেই; তারা হয়তো সুন্দর বা কুৎসিত; চাতুর্যপূর্ণ অথবা বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক হতে পারে; যে-কোনো মতকে গ্রহণ বা ত্যাগ করা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের উপর। যে উপদেশ তুমি শুনেছ তা আমার একটা মত মাত্র নয়; জ্ঞানলিপ্সুদের নিকট জগৎকে ব্যাখ্যা করবার উদ্দেশ্যও আমার নয়। আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন; দুঃখের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করাই আমার লক্ষ্য। গৌতম তা-ই শিক্ষা দেয়, অন্য কিছু নয়।'

তরুণ সন্ন্যাসী বলল, 'হে মহাত্মন, আমার ওপর রুষ্ট হবেন না। আপনার উপদেশ নিয়ে তর্ক করতে আমি আসিনি। আপনি যথার্থ বলেছেন—মতামতের মূল্য নেই। কিন্তু আমার একটি নিবেদন, আপনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে

মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ হয়নি যে আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন এবং লক্ষ্যের সেই উচ্চ শিখরে উঠেছেন, যেখানে পৌঁছবার জন্য হাজার হাজার ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-তনয় সাধনা করছে। নিজে পথ খুঁজে খুঁজে আপনি লক্ষ্যে পৌঁছেছেন, আপনি নিজের মতো করে চিন্তা ও ধ্যান করেছেন; তারপর স্বোপার্জিত জ্ঞানের আলোকে সহসা একদিন পথের রেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। উপদেশ থেকে আপনি কিছু শিক্ষালাভ করেননি; এবং হে মহাভিক্ষু, আমার মনে হয়, অপরের উপদেশের সাহায্যে কেউ মোক্ষলাভ করতে পারে না। হে মহাভাগ, বন্ধুত্ব লাভের সেই চরম মুহূর্তে আপনার অন্তরে কী ঘটেছিল তা বাক্যে কিংবা উপদেশের সাহায্যে অন্যকে বুঝিয়ে বলা হয়; অসৎপথ ত্যাগ করে কীভাবে সৎপথে চলতে হবে সে শিক্ষাও পাওয়া যায়; কিন্তু লক্ষ লক্ষ মুমুক্ষুর মধ্যে একমাত্র মহাত্মা বুদ্ধ কী অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার পরিচয় উপদেশের মধ্যে পাওয়া যাবে না। আপনার উপদেশ শুনবার পর থেকে এই কথা উপলব্ধি করেছি এবং তাই নিয়ে ভাবছি। এজন্যই আমি আবার যাত্রা শুরু করব; এর চেয়ে ভালো শিক্ষার অনুসন্ধানে যাচ্ছি না। কারণ জানি, এর চেয়ে ভালো উপদেশ নেই। সকল গুরু এবং তাদের শিক্ষা ত্যাগ করে নিজের পথ ধরে একাকী লক্ষ্যে পৌঁছব, অথবা প্রাণ দেব— এই সংকল্প নিয়ে আবার পথ চলব। কিন্তু আজকের দিনটির কথা প্রায়ই আমার মনে পড়বে; মনে পড়বে এই মুহূর্তটির কথা যে, মহাপুরুষ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।'

বুদ্ধের চোখ মাটির উপর নিবদ্ধ, সমুদ্রের মতো অতলস্পর্শ তাঁর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে গম্ভীর প্রশান্তি। মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি আশা করি তোমার যুক্তিতে ভুল নেই। তুমি সিদ্ধি লাভ কর, এই কামনা করি। কিন্তু তুমি তো দেখেছ, আমার চারপাশে কত ধর্মজিজ্ঞাসুর ভিড় হয় এবং তাদের মধ্যে কত লোক আমার শিক্ষা গ্রহণ করছে। হে বিদেশি সন্ন্যাসী, তুমি কি মনে কর তারা যদি আমার শিক্ষা ত্যাগ করে ফিরে যায় সংসারের কামনা-বাসনার মধ্যে, তাহলেই তাদের মঙ্গল হবে?'

'সে কথা একবারও আমার মনে হয়নি', তাড়াতাড়ি বলে উঠল সিদ্ধার্থ। 'তারা সকলে আপনার শিক্ষা অবলম্বন করে সিদ্ধিলাভ করুক! অন্যের জীবন সম্বন্ধে বিচার করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আমার জীবনের বিচার আমি নিজে করতে চাই। পথ গ্রহণ এবং বর্জন করবার অধিকার আমারই থাকবে। আমরা যারা ঘর ছেড়েছি তারা মুক্তি চাই অহং থেকে। আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে যে মুক্তি পেতাম তা হত বাহ্যিক; মুক্তির প্রতারণা দিয়ে নিজের মনকে শান্ত করতে চেষ্টা করতাম, যদিও প্রকৃতপক্ষে আপনার শিক্ষায় নতুন রূপ পেয়ে অহং নতুন বলে বলীয়ান হয়ে বেঁচে উঠত; আপনার এবং ভিক্ষুসমাজের প্রতি আমার আনুগত্য ও ভালোবাসার মধ্যে পেত বেঁচে থাকবার শক্তি।'

শান্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত এবং বন্ধুত্বে কোমল মুখে আধফোটা হাসি দেখা দিল। বুদ্ধ স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলেন বিদেশিকে, তারপর প্রায় অলক্ষ্য

এক ভঙ্গি করে বিদায়ের ইঙ্গিত জানালেন। বিদায় নেবার আগে বললেন, 'হে সন্ন্যাসী, তোমার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ; চমৎকার করে কথা বলবার কৌশলও তোমার জানা আছে বন্ধু। কিন্তু অতিবুদ্ধির হাত থেকে সাবধান!'

বুদ্ধ ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন; সিদ্ধার্থের স্মৃতির পটে চিরকালের জন্য আঁকা হয়ে রইল তাঁর স্থিরদৃষ্টি এবং আধফোটা হাসি।

সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগল এমন দৃষ্টি ও হাসি, এমন চলা ও বসা সে আর কোনো লোকেরই দেখেনি। সিদ্ধার্থের মনে হল : আমারও আকাঙ্ক্ষা তেমনি হাসি, চাওয়া, বসা ও চলা; তেমনি মুক্ত, গুণী, সংযমী; সরল এবং শিশুর মতো অথচ রহস্যময় হতে চাই আমি। কিন্তু অহংকে জয় না করতে পারলে কেউ অমন দৃষ্টি, অমন হাসি পেতে পারে না। আমি অহংকে জয় করব।

'শুধু একজন লোক দেখেছি যাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আমার চোখ নত হয়। কত লোক দেখেছি, কিন্তু এমন লোক শুধু একজন'— মনে মনে বলল সিদ্ধার্থ। 'আর কারো সামনে আমার দৃষ্টি নত হবে না। এঁর ধর্মশিক্ষাই আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, সুতরাং অন্য কোনো ধর্মোপদেশও পারবে না।'

সিদ্ধার্থ ভাবল : বুদ্ধ আমার সব কেড়ে নিয়েছেন। কিন্তু আমার সবকিছু হরণ করেও ফিরিয়ে দিয়েছেন তার চেয়ে মূল্যবান জিনিস। তিনি অপহরণ করেছেন আমার বন্ধুকে। গোবিন্দের আস্থা ছিল আমার ওপর, সে এখন নির্ভর করবে বুদ্ধের ওপর। একদিন গোবিন্দ ছিল আমার ছায়া, সে এখন হয়েছে গৌতমের ছায়া। কিন্তু তিনি আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধার্থকে, আমাকে।

জাগরণ

যে উদ্যানে বুদ্ধ আছেন, সেখানে তার সঙ্গে গোবিন্দও রয়ে যাচ্ছে; সেই স্থান ছেড়ে যেতে সিদ্ধার্থের মনে হল সে যেন তার অতীত জীবনটাকেই রেখে যাচ্ছে সেই উদ্যানে। ধীরে ধীরে পথ চলছে সিদ্ধার্থ; তার মস্তিষ্ক নানা এলোমেলো চিন্তায় পূর্ণ। গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে সে বিশৃঙ্খল ভাবনার মধ্যে কারণ খুঁজে পেল। যেখানে কারণ আছে চিন্তা সেখানেই সার্থক। চিন্তার সাহায্যে অনুভূতি জ্ঞানে পরিণত হয়, স্থায়িত্ব লাভ করে, তার হারিয়ে যাবার ভয় থাকে না।

পথ চলতে চলতে সিদ্ধার্থ গভীরভাবে ভাবতে লাগল। সে জানে যৌবন পার হয়ে গেছে, এখন সে পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। সে উপলব্ধি করতে পারছে সাপের খোলসের মতো কী যেন তাকে ত্যাগ করে গেছে। যৌবনের সেই বছরগুলোকে কী যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজ বুঝতে পেরেছে গুরু খুঁজে বের করে তাঁর উপদেশ শুনবার জন্য সে পাগলের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু সে দিন আর নেই। বুদ্ধের মতো মহাত্মা, জ্ঞানী, শ্রেষ্ঠ এবং পুণ্যাত্মাকেও সিদ্ধার্থ

গুরু বলে স্বীকার করতে পারল না; গ্রহণ করতে পারল না তাঁর উপদেশ। তাই সিদ্ধার্থ দূরে সরে এসেছে।

ভাবনায় ডুবে পথ চলছে সিদ্ধার্থ। প্রশ্ন করছে নিজেকে : গুরুর কাছ থেকে, তাদের উপদেশ থেকে, কী শিখতে চেয়েছিলে তুমি? হয়তো তাঁরা তোমাকে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু কী দিতে পারেননি? অহংকে বুঝতে চেয়েছিলাম, জানতে চেয়েছিলাম তার ধর্ম ও প্রকৃতি। মুক্তি চেয়েছিলাম অহং থেকে, চেয়েছিলাম তাকে জয় করতে, কিন্তু পারিনি; শুধু আত্মসত্তার সঙ্গে প্রতারণা করেছি, তার কাছ থেকে পালিয়েছি, আত্মগোপনের ভান করে মুখ ঢেকেছি। সত্যি, এই অহংকে জানবার জন্য যত ভেবেছি পৃথিবীতে আর কিছুর জন্যই তা করিনি। এই যে আমি বেঁচে আছি, সংসারে সকলের সাথে এক হয়েও পৃথক ও বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব নিয়ে আছি, সিদ্ধার্থ নাম নিয়ে আলাদা ব্যক্তিসত্তা বজায় রেখেছি, এটাই একটা মস্তবড় হেঁয়ালি। আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে কম জানি নিজেকে, সিদ্ধার্থ সম্বন্ধে।

এই চিন্তা সিদ্ধার্থকে জাপটে ধরল; তার মৃদুগতিও একেবারে থেমে গেল। কিন্তু পরমুহূর্তে এই ভাবনার পথ বেয়ে এল আর একটি নতুন চিন্তা, নিজেকে না জানবার কারণ কী? একটি কারণে সিদ্ধার্থ নিজের কাছে অচেনা বিদেশির মতো হয়ে রয়েছে; সে কারণ হল : আমি নিজেকেই ভয় করেছি, নিজের কাছ থেকে সারাক্ষণ পালিয়ে বেড়িয়েছি। আমি খুঁজেছি আত্মাকে, ব্রহ্মকে; আত্মা, জীবন, পরমব্রহ্ম এবং অন্তর্বাসী অপরিজ্ঞাত মূলধারাকে খুঁজতে গিয়ে নিজেকে ক্ষয় করেছি, তিলে তিলে অগ্রাহ্য করেছি নিজের অস্তিত্বকে। আর তা করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি আজ পথের মাঝখানে।

সিদ্ধার্থ একবার আকাশের দিকে চোখ তুলল, চেয়ে দেখল চারিদিকে। মৃদু প্রসন্ন হাসিতে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, দীর্ঘ স্বপ্নের পর জাগরণের প্রবল অনুভূতি যেন তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তুলছে! আর দ্বিধা নয়; দ্রুত পা ফেলে সে চলতে শুরু করল; এবার লক্ষ্যের কোনো অনিশ্চয়তা নেই।

'না, আর সিদ্ধার্থের কাছ থেকে মুক্তি চাইব না।' মনে মনে ভাবল সে। 'আত্মার কথা ভাবব না; সংসারের দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে যাব। নিজেকে তিলে তিলে ক্ষয় করে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে কোনো গোপন আবিষ্কার আর করতে চাই না। ঋগ্বেদ অথর্ববেদ পড়া বন্ধ করলাম; সন্ন্যাসবৃত্তিতে আর আস্থা নেই, শুনব না কোনো উপদেশ। এবার থেকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাকে শিক্ষা দেবে, নিজেই হব নিজের ছাত্র। সিদ্ধার্থের সকল রহস্য আমি শিখে নেব নিজের কাছ থেকে।'

আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখল সিদ্ধার্থ—যেন পৃথিবীকে এই প্রথম দেখছে। পৃথিবী কত সুন্দর ও রহস্যময়, কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে অপরিচিত। কত রঙের সমারোহ—নীল, সবুজ, হলুদ; আকাশ ও নদী, বন ও পর্বত—সব অপূর্ব সুন্দরময়, মনোমুগ্ধকর; এই দৃশ্যের মধ্যদিয়ে সদ্যজাগরিত সিদ্ধার্থ পথ চলছে;

সে ফিরে যাচ্ছে নিজের কাছে। এই নীল, হলুদ, নদী ও বন যেন আজ সিদ্ধার্থের চোখে প্রথম পড়ল। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য এখন আর মায়ার কুহক নয়, বিশ্বের অর্থহীন বিচিত্র প্রকাশ নয়; শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা এই বৈচিত্র্যকে অবজ্ঞা করেন, তাঁরা খোঁজেন অভিন্নতা। অথচ পরম ব্রহ্মের অভিপ্রায় অনুসারেই সৃষ্টির বিচিত্র রূপ দেখা দিয়েছে; আমরা দেখি নদী, আকাশ ও বন। পরম শিল্পীর ইচ্ছানুসারেই এসেছে সবুজ ও হলুদ; সুতরাং বাহ্যিক বৈচিত্র্যের মধ্যে আছে অভিন্ন যোগসূত্র; নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তার অভিপ্রায় রয়েছে এই বৈচিত্র্যের মূলে।

দ্রুত পা ফেলে চলেছে সিদ্ধার্থ আর ভাবছে : কী নির্বোধ ছিলাম আমি! শুনেছি শুধু একধরনের উপদেশ; আর কোনো কথা কানে তুলিনি। বধির হয়ে আমার জীবন কেটেছে। কেউ যদি বই পড়তে চায়, তাহলে সে অক্ষর ও যতিচিহ্নগুলি অগ্রাহ্য করতে পারে না, বলতে পারে না এরা মায়া, এরা শুধুই অকেজো খোলস। সে সারি সারি অক্ষরগুলোকে সযত্নে পড়ে, তাদের ভালোবাসে, আঁকাবাঁকা কালো দাগগুলো থেকে অর্থ খুঁজে নেয়। কিন্তু আমি পৃথিবীর ও নিজের জীবনের পুঁথি পড়তে গিয়ে বর্ণমালা উপেক্ষা করেছি, অগ্রাহ্য করেছি সংকেতচিহ্ন। এই দৃশ্যমান জগৎকে মায়া বলে উড়িয়ে দিয়েছি; নিজের চোখ ও জিহ্বাকেও বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন আমি জেগে উঠেছি, আমার ভুল ভেঙেছে, এবার সত্যি ঘুম ভাঙল; আজকেই যেন জন্ম হল সিদ্ধার্থের।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায় পায়ের সামনে যেন সাপ দেখেছে। হঠাৎ একঝলক আলোর মতো নিজের অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে; সদ্যোজাত শিশুর মতো সম্পূর্ণ নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে হবে। সকালে জেতাবনে সে যখন জেগে উঠেছিল, ভগবান বুদ্ধের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন সে নতুন-পাওয়া পথ ধরে ফিরে যাচ্ছিল নিজের কাছে, তখন মন চাইছিল এতদিন সন্ন্যাসব্রতের পর গৃহে ফিরে যাবে, পিতার কাছে ফিরে যাবে। বাড়ি ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষাই স্বাভাবিক! কিন্তু সামনে সাপ পড়ার মতো সে থমকে দাঁড়াল। তার মনে হল : আমি যা ছিলাম তা আর নেই; এখন আমি সন্ন্যাসী নই, পুরুত নই, ব্রাহ্মণ নই। বাড়ি ফিরে কী করব? আবার অধ্যয়ন আরম্ভ করব? যাগযজ্ঞ? অথবা তপস্যা? এখন আমার কাছে এসব শেষ হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; মুহূর্তের জন্য তার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল পৃথিবীতে সে কত নিঃসঙ্গ, কত একা। ভীত পাখির মতো তার বুক কেঁপে উঠল। বছরের পর বছর গৃহহীন জীবন কেটেছে পথে পথে, এতদিন যা অনুভব করেনি, যে অভাব মনে জাগেনি, আজ সে উপলব্ধি তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। এতদিন গভীরতম ধ্যানের মধ্যেও সে ছিল তার পিতারই পুত্র, উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব, ধার্মিক। এখন সে শুধু সিদ্ধার্থ; যে সিদ্ধার্থ এখন প্রলুব্ধ, যে সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙেছে। এ ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই তার। সিদ্ধার্থের শ্বাস-প্রশ্বাস গভীর হল, মুহূর্তের জন্য আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। না,

তার মতো নিঃসঙ্গ কেউ নেই পৃথিবীতে। সে অভিজাত সমাজের কেউ নয়; আবার কারিগর গোষ্ঠীরও কেউ নয় যারা তাদের জীবন ও ভাষাকে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারে না; আর সন্ন্যাসীও সে নয় যে তাদের সাথে পথ চলবে। সংসারত্যাগী একা যে সন্ন্যাসী গভীর অরণ্যে বাস করে সে সাথীহীন নয়, একা নয়; সে তপস্বী সমাজের একজন। তারও একটা গোত্র আছে। গোবিন্দ ভিক্ষু হয়েছে, পেয়েছে হাজার হাজার ভিক্ষুর ভ্রাতৃত্ব। তার গৈরিক বসন মিলে যায় হাজার হাজার ভিক্ষুর গৈরিকে; তাদের সাথে এক বিশ্বাস, এক ভাষা গোবিন্দ ভাগ করে গ্রহণ করে। কিন্তু সিদ্ধার্থ কোন্ দলে? কার জীবনে সে ভাগ বসাবে? কার ভাষা তাকে ভাষা দেবে?

সিদ্ধার্থের চোখের সামনে দিয়ে যেন পৃথিবী হারিয়ে গেল; আর কিছু নেই, সে শুধু আকাশের বুকে সঙ্গীহীন শুকতারার মতো দাঁড়িয়ে আছে। হতাশার শীতল প্রবাহ তাকে অভিভূত করে ফেলল; কিন্তু তথাপি এই মুহূর্তে সে একান্তভাবে নিজের ওপর নির্ভর করে যেমন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে, এমন আর কখনো পারেনি। জাগরণের এই শেষ কম্পন, নবজন্মের এই শেষ বেদনা-বিক্ষোভ। হঠাৎ সে আবার চলতে আরম্ভ করল দ্রুত, অস্থিরগতিতে। গৃহাভিমুখে নয়, পিতার কাছে নয়, পশ্চাতে ফিরে চাওয়া নয়; চলছে সামনে, শুধুই সামনে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কমলা

সিদ্ধার্থের চোখে পৃথিবীর রূপ বদলে গেছে; এতদিন যা চোখে পড়েনি এখন তা নতুন করে সে দেখছে। পদে পদে নতুন জিনিস চোখে পড়ে তার, পৃথিবীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যায় সিদ্ধার্থ। পর্বত ও বনের উপর দিয়ে সূর্যোদয় হয়, আবার নদীতীরে তালগাছের সারির পেছনে সে ডুবে যায়। রাতের আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলজ্বল করে ফুটে ওঠে, কাস্তের মতো বাঁকা চাঁদ নৌকার মতো নীল আকাশের উপর দিয়ে ভেসে চলে। গাছপালা, নক্ষত্র, পশু, মেঘ, রামধনু, পাহাড়, আগাছা, ফুল ও নদী, সকালবেলা পাতায় পাতায় চকচকে শিশিরবিন্দু, দূরের আবছা নীল পর্বতচূড়া, ধানের ক্ষেতে বাতাসের ঢেউ— সব যেন সিদ্ধার্থ এই নতুন দেখছে; দুচোখ দিয়ে পান করে সে তাদের সৌন্দর্যসুধা। কান ভরে শোনে সে পাখির গান আর মৌমাছির গুঞ্জন। বিচিত্র রঙ ও বিচিত্র আকার নিয়ে এগুলো আগেও ছিল, চিরদিন থাকবে। অনন্তকাল ধরে সূর্য-চাঁদের আকাশ-পরিক্রম চলছে, নদী সমুদ্রের দিকে ছুটে চলছে এবং মৌমাছিরা গুঞ্জন করছে; আগে সিদ্ধার্থের কাছে এদের কোনো মূল্য ছিল না; এরা অনিত্য, চোখের সামনে শুধু মায়ার অবগুণ্ঠন টেনে দেয়; তাই পৃথিবীর রূপকে সে দেখত সন্দেহের চোখে, সচেতন মন থেকে তাদের ছেঁটে ফেলে দিয়েছিল; কারণ এরা তো সত্য নয়; সত্য আছে দৃশ্যজগতের ওপারে। কিন্তু এখন তার সতৃষ্ণ চোখ এপারে আটকে গেল। বাইরের জগৎকে সে চিনতে পেরেছে, পৃথিবীতে এখন তার নিজের স্থান সে খুঁজে নিতে চায়। প্রকৃত সত্তার সন্ধান করতে গিয়ে সে আর সময় নষ্ট করবে না; চোখের সামনে যে জগৎকে দেখছে তাকে অগ্রাহ্য করে অপরিচিত, দৃশ্যাতীত কোনো জগতের মোহে আর ভুলবে না।

শিশুর সরল চোখ দিয়ে দেখলে পৃথিবীকে কতই-না সুন্দর মনে হয়! তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা দিয়ে পৃথিবীকে বিচার করতে গেলেই সে সৌন্দর্য কর্পূরের মতো উবে যায়। চন্দ্র ও নক্ষত্র, নীহারিকা, নদীতীর, বন, পাহাড়, সোনালি পোকা, ফুল এবং প্রজাপতি সবই সুন্দর। নবজাত শিশুর মতো পৃথিবীর সৌন্দর্যে মগ্ন থাকলে, প্রত্যক্ষকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারলে যা অপ্রাপ্য ও সুদূর তার জন্য দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লাভ কী? কোথাও প্রখর রোদ, আবার কোনো বনের কোলে স্নিগ্ধ ছায়া; কোথাও কলার ছড়া, আবার কোনো মাচা থেকে ঝুলছে লাউ। দিন আর রাত দ্রুত পার হয়ে যায়; পাল-তোলা আনন্দের রত্ন-বোঝাই নৌকার মতো

প্রহরগুলো ছুটে পালায়। এতদিন দেখেনি, কিন্তু আজ তার চোখে পড়ল গভীর বনে গাছের মাথায় মাথায় বানরের দল উচ্চকিত আনন্দে কিচিরমিচির করে লাফালাফি করছে। পথ চলতে চলতে মেষদম্পতির মিলনের দৃশ্য তার চোখ এড়াল না। একটু পরে দেখল পথের পাশের নলখাগড়াপূর্ণ দিঘির পানিতে একটা ক্ষুধার্ত গজার মাছ শিকারের সন্ধানে হন্যে হয়ে ছুটছে। ছোটমাছের ঝাঁকগুলো ছুটে পালাচ্ছে প্রাণের ভয়ে। দ্রুতগতির কারণে তাদের আঁশগুলো ঝকঝক করে উঠল। অনুসরণকারী লোভী মাছটা ঘাই দিয়ে দিয়ে জলে আবর্তের সৃষ্টি করছে। দিঘির ঘূর্ণাবর্তে ফুটে উঠেছে শিকারির বলদৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার স্বাক্ষর।

এসব তো আগেও ছিল; আছে চিরদিন। শুধু সিদ্ধার্থ ছিল না, সে চোখ মেলে এসব দেখেনি। আজ সে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে নিজের মধ্যে, সংসারের মাঝখানে। সে আজ সংসারের একজন—এই গাছপালা, পশু-পাখি, সূর্য-চন্দ্রের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ। চোখ দিয়ে আজ সে আলো-ছায়া দেখে, মন দিয়ে অনুভব করে চন্দ্র ও নক্ষত্রের অস্তিত্ব।

পথ চলতে চলতে সিদ্ধার্থের মনে পড়ে জেতাবনের কথা। বুদ্ধদেবের উপদেশ, গোবিন্দের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং বুদ্ধের সঙ্গে আলোচনা। বুদ্ধদেবকে যে-কথাগুলো সে বলেছে তার কিছুই সে ভোলেনি। সিদ্ধার্থ আশ্চর্য হয়ে গেল। সম্পূর্ণ অর্থ না-বুঝেই তখন যে-কথাগুলো বলেছে, এখন তাদের অর্থ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বুদ্ধদেব নিজের সাধনা দ্বারা যে প্রজ্ঞা লাভ করেছেন তা শেখানো যায় না, সেটা তারই অন্তরের গোপন ধন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির শুভমুহূর্তে শাক্যমুনির যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতা লাভ করবার সংকল্প নিয়েই সিদ্ধার্থ যাত্রা করেছে নতুন পথে। মনে হয়, সেই অভিজ্ঞতার স্বাদ সে পেতে আরম্ভ করেছে এরই মধ্যে। অন্যের উপদেশ থেকে কিছু শেখা যায় না; নিজের জীবন ক্ষয় করে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়, অন্য কোনো পথ নেই। বহুদিন থেকেই সিদ্ধার্থ জানে তার অন্তরবাসী আত্মা শাশ্বত ব্রহ্মের অংশ; কিন্তু নিজের সত্তাকে সে কোনোদিন প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। দার্শনিক তত্ত্বের জটিল জালে আত্মাকে শুধু বন্দি করে রেখেছিল।

আত্মা কী? ব্যক্তি-সত্তা কী? শুধু এই দেহ নয়, ইন্দ্রিয়ানুভূতির খেলা নয়, তত্ত্বচিন্তা নয়, বোধশক্তি নয়, অর্জিত জ্ঞান নয়, তর্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা নয়; শুধু অনুভূতি দমন করে পাণ্ডিত্যের চর্চা নয়। অনুভূতি ও ধ্যান দুই-ই ভালো, উভয়েরই প্রয়োজন, কিন্তু জীবনের চরম অর্থ লুকানো আছে এ দুয়ের পশ্চাতে। তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি—এই উভয়ের দাবিই মেটানো উচিত; কেউই অবজ্ঞার পাত্র নয়; আবার একটিকে প্রাধান্য দিলেও ভুল করা হবে। দুটি দাবিই শুনতে হবে মন দিয়ে। সিদ্ধার্থ এখন থেকে শুধুই আত্মার আজ্ঞা পালন করবে; শুধু সেখানেই থামবে যেখানে পাবে বিবেকের নির্দেশ। বুদ্ধত্বলাভের শুভক্ষণে গৌতম বোধিবৃক্ষের নিচে কেন বসেছিলেন? তিনি একটি স্বর শুনতে পেয়েছিলেন; অন্তরবাসী আত্মার আদেশ—এল ওখানে বিশ্রাম নিতে। গৌতম সেই আদেশ শিরোধার্য করলেন। দেহের পীড়ন, গোসল, আহার, প্রার্থনা, নিদ্রা, স্বপ্ন— সব ছেড়ে দিলেন তিনি। শুনলেন শুধু বিবেকের নির্দেশ, বোধিবৃক্ষের নিচে

গিয়ে বসলেন বিশ্রাম করতে। আর কারো নির্দেশ কানে তুলব না, শুনব শুধু অন্তরের ডাক— আর সেই আহ্বানের জন্য সর্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকব। এই তো উত্তম পথ, একমাত্র পথ, আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই।

সেদিনকার পথ-চলা শেষ হলে খেয়াঘাটে পাটনীর কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করল সিদ্ধার্থ। রাত্রে স্বপ্ন দেখল, বৌদ্ধভিক্ষুর গৈরিক বস্ত্রে সজ্জিত গোবিন্দ তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিষণ্নকণ্ঠে গোবিন্দ প্রশ্ন করল, 'আমাকে ছেড়ে এলে কেন?' সিদ্ধার্থ গোবিন্দকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল। কিন্তু এ কী! গোবিন্দ কোথায় মিলিয়ে গেল, তার বাহুবন্ধনে ধরা দিল এক নারী। তার অন্তর্বাসের অন্তরাল থেকে দেখা দিল পরিপূর্ণ স্তন। সিদ্ধার্থ সেই অপরিচিতার বুক থেকে মধুর বলপ্রদ পীযূষধারা পান করতে লাগল প্রাণভরে। নারী ও পুরুষ, সূর্য ও বন, প্রাণ ও পুষ্প, সকল ফলের মাধুর্য এবং সমুদয় আনন্দের স্বাদ মিশে আছে এই অভিনব পয়োধরের মধ্যে। সিদ্ধার্থের যখন ঘুম ভাঙল তখন কুটিরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল নদীর ক্ষীণজ্যোতি স্রোতধারা। দূরের কোনো বনে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে পেঁচা ডেকে উঠল।

রাত শেষ হল। সিদ্ধার্থ পাটনীকে অনুরোধ করল নদী পার করে দিতে। বাঁশের ভেলায় করে পাটনী সিদ্ধার্থকে নদী পার করে দিল। ভোরের সূর্যের রক্তিম কিরণে নদীর বুক ঝলমল করছে।

সিদ্ধার্থ বলল, 'বেশ সুন্দর নদী।'

পাটনী বলল, 'হ্যাঁ সত্যি খুব সুন্দরী নদী। পৃথিবীতে এই নদীর মতো আর কিছুকে এত ভালোবাসি না। কান পেতে ওর কুলকুল ধ্বনি শুনি, অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে থাকি! এই নদীর কাছ থেকে আমি সর্বদাই কিছু-না-কিছু শিখতে পাই। নদীর কাছ থেকে কত কী শেখার আছে।'

ওপারের ঘাটে নেমে সিদ্ধার্থ বলল, 'তোমাকে ভাই অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ভাড়া দেবার পয়সা আমার নেই; উপহার বলে কিছু যে দেব তেমন কিছু জিনিসও নেই। আমি ব্রাহ্মণপুত্র এবং সন্ন্যাসী।'

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে পাটনী বলল, 'তা তো দেখেই বুঝেছি। তোমার কাছ থেকে ভাড়া কিংবা উপহার আমি আশা করিনি। অন্য কোনো সময় যখন সুবিধে হবে তখন পারের কড়ি মিটিয়ে দিও।'

শান্তকণ্ঠে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি সত্যি মনে কর আমি আবার আসব?'

'নিশ্চয়, আমি নদীর কাছ থেকেই শিখেছি সবকিছু ফিরে আসে। হে সন্ন্যাসী, তুমিও একদিন ফিরে আসবে। এখন তাহলে যাই, তোমার বন্ধুত্ব দিয়ে ভাড়া শোধ করে দাও। যখন দেবতার অর্চনা করবে তখন আমার জন্য একটু প্রার্থনা কোরো।'

হাসিমুখে তারা বিদায় গ্রহণ নিল। পাটনীর বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারে সিদ্ধার্থ আনন্দ লাভ করেছে। অনেকটা যেন গোবিন্দের মতো মনে হল এই খেয়াঘাটের মাঝিকে। গোবিন্দের কথা মনে পড়তেই সিদ্ধার্থের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যত লোকের সঙ্গে পথে দেখা হয়েছে সবার মধ্যে সে দেখতে পেয়েছে গোবিন্দের ছায়া। সকলেই তাকে পেয়ে কৃতজ্ঞ, অথচ সে কৃতজ্ঞতা তাদের প্রাপ্য; সকলেই অনুগত,

সকলেই চায় বন্ধু হতে, প্রশ্ন না করে মেনে নেয় তার কথা। লোকগুলো শিশুর মতো।

দুপুরবেলা সিদ্ধার্থ এসে পৌঁছল এক গ্রামে। দুপাশে ছোট ছোট মাটির ঘর, মাঝখানে সরু গলি। সে গলিতে ছেলেমেয়েরা নেচে-নেচে খেলা করছে, হুড়োহুড়ি করছে, আর হল্লা করছে মনের আনন্দে। কিন্তু অচেনা সন্ন্যাসী এগিয়ে আসতেই তারা ভয়ে পালিয়ে গেল। গ্রামের প্রান্তে পথ চলেছে একটি ছোট্টনদীর পাশ দিয়ে এঁকেবেঁকে; পানির ধারে বসে একটি তরুণী কাপড় কাচছে, সিদ্ধার্থ তাকে সম্ভাষণ জানাল। তরুণী হাসিমুখে চোখ তুলে তাকাল, সিদ্ধার্থ লক্ষ করল তার চোখের শাদা অংশ ঝলঝল করছে। রীতিসম্মত আশীর্বাদ করে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, নগরে পৌঁছাতে পথ আর কতটা আছে। তরুণী উঠে এল তার কাছে। তরুণীর মধুর মুখমণ্ডলে রসসিক্ত প্রদীপ্ত ওষ্ঠাধর প্রলোভন জানায়। সিদ্ধার্থের সঙ্গে হালকা আলাপ করল কিছুক্ষণ; জানতে চাইল খাওয়া হয়েছে কি না; তারপর প্রশ্ন করল : সন্ন্যাসীদের নারীহীন নিঃসঙ্গ শয্যায় রাত কাটাতে হয় বনে—এ কি সত্যি? তারপর আরো এগিয়ে এসে বাঁ পা রাখল সিদ্ধার্থের ডান পা'র ওপর, মনোমুগ্ধকর অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে ইঙ্গিত করল—মেয়েদের কাছ থেকে যে ইঙ্গিত পেয়ে পুরুষের রক্তে আগুন ধরে। সিদ্ধার্থের রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, মনে পড়ল গতরাতের স্বপ্নের কথা। সে নত হয়ে তরুণীর বুকে একটি চুম্বন এঁকে দিল। চেয়ে দেখল তরুণীর হাস্যস্ফুরিত মুখ আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল, তার অর্ধনিমীলিত চোখে কামনার মিনতি।

কামনার তাড়নায় সিদ্ধার্থের রক্তপ্রবাহ চঞ্চল হয়ে উঠল, জেগে উঠল তার ঘুমন্ত পৌরুষ। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু মন এখনো তৈরি হয়নি। কখনো নারী স্পর্শ করেনি, তাই একটু দ্বিধা দেখা দিয়েছে। সেই দ্বিধার সংকীর্ণ মুহূর্তে অকস্মাৎ শুনতে পেল অন্তরবাসী আত্মার নির্দেশ : না, এখনো নয়।

সহসা তরুণীর হাস্যোজ্জ্বল মুখ থেকে সকল জাদু দূর হয়ে গেল। শুধু একটি যুবতীর কামনার জ্বলন্ত দৃষ্টি ছাড়া আর কিছু নেই সেই মুখে। তরুণীর গালে কোমল স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে সিদ্ধার্থ দ্রুতপায়ে পথের বাঁকে বাঁশবনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আশাহত যুবতী একনজরে চেয়ে রইল অচেনা পথিকের অজানা পথের দিকে।

সন্ধ্যার আগেই সিদ্ধার্থ নগরে এসে পৌঁছল। খুশি হল সে। মনে জেগেছে জনতার মধ্যে বাস করার আকাঙ্ক্ষা। দীর্ঘকাল কেটেছে বনে, লোকালয়ের বাইরে। কাল রাতে ছিল পাটনীর কুটিরে। কতদিন পরে ছাদের নিচে ঘুমিয়েছে।

শহরের উপকণ্ঠে মনোরম উদ্যানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সিদ্ধার্থের চোখে পড়ল একটি ছোট শোভাযাত্রা। একদল ঝি-চাকর চলেছে নানাবিধ দ্রব্যপূর্ণ ঝাড়ি মাথায় করে। আর মাঝখানে কর্ত্রী চলেছেন কারুকার্যখচিত চতুর্দোলায় চড়ে। কর্ত্রী বসেছেন লাল গদিতে, মাথার উপর খাটানো হয়েছে রঙিন চাঁদোয়া। একরাশ কালো চুলের নিচে উজ্জ্বল, বড় মধুর, অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানি; সদ্য-কাটা ডুমুরের মতো রক্তিম ওষ্ঠাধর; গভীর কালো চোখে সজাগ দৃষ্টি; একজোড়া সুক্ষ্ম ভ্রূ—মনে হয় যেন তুলি দিয়ে আঁকা। সবুজ শাড়ির সোনালি পাড় ছাড়িয়ে দেখা যায় সুকুমার গ্রীবা; দৃঢ় ও মসৃণ, দীর্ঘ ও কমনীয় দুই বাহু; মণিবন্ধ জুড়ে আছে সোনার বালা।

এই অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে সিদ্ধার্থ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চতুর্দোলা তার গা ঘেঁষে যাবার সময় মাথা নত করে সে অভিবাদন জানাল, একবার তাকাল সেই রূপদীপ্ত মুখের দিকে, একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল রমণীর বঙ্কিম চোখের ওপর। বাতাসে ভেসে এল অজানা সুগন্ধির সুবাস, সিদ্ধার্থ যার পরিচয় আগে কখনো পায়নি। এক লহমার জন্য রূপসী রমণী সহাস্যে মাথা হেলিয়ে সিদ্ধার্থকে স্বীকৃতি জানাল; তারপর চতুর্দোলা অদৃশ্য হয়ে গেল বাগানের মধ্যে।

সিদ্ধার্থ মনে মনে ভাবল, বড় শুভক্ষণে এসেছি এই নগরে। তখুনি শোভাযাত্রার পেছনে পেছনে উদ্যানে প্রবেশ করবার প্রবল ইচ্ছা হল। কিন্তু মনে পড়ল ঝি-চাকরের দল তাকে অবজ্ঞা ও সন্দেহসূচক দৃষ্টি দিয়ে অগ্রাহ্য করে গেছে।

সিদ্ধার্থের খেয়াল হল : এখনো আমি সন্ন্যাসী, এখনো ভিক্ষুক। এ বেশে তো উদ্যানে যাওয়া যায় না। সিদ্ধার্থ নিজের নির্বোধ আকাঙ্ক্ষার কথা মনে করে হেসে উঠল।

রাস্তায় প্রথম যার সঙ্গে দেখা হল তাকে জিজ্ঞাসা করে সিদ্ধার্থ জানতে পারল চতুর্দোলার রমণীর নাম কমলা—সুপরিচিতা বারাঙ্গনা। এই বাগানবাড়ি ছাড়া শহরে তার আরো বাড়ি আছে। তাপস সিদ্ধার্থ শহরে প্রবেশ করল। একটিমাত্র লক্ষ্য তার। সেই লক্ষ্যের কথা মনে রেখে শহর পর্যবেক্ষণ করতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। নগরে আঁকাবাঁকা পথে পথে ঘুরে বেড়াল, কোথাও-বা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, আবার হয়তো শানবাঁধানো নদীর ঘাটে বসে বিশ্রাম করল।

সন্ধ্যাবেলা আলাপ হল এক নাপিতের সঙ্গে। দুজন মিলে আরতি দেখতে গেল বিষ্ণুমন্দিরে। লক্ষ্মী ও বিষ্ণুর কাহিনী শুনিয়ে নাপিতের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলল সিদ্ধার্থ। নদীর ঘাটে বাঁধা একটা নৌকায় রাতটা কাটিয়ে দিল। পরদিন খুব সকালে, অন্য কোনো খদ্দের আসবার আগেই, নাপিতকে দিয়ে দাড়ি কামিয়ে পরিচ্ছন্ন হল। নাপিত সুগন্ধি তেল দিয়ে তার কেশবিন্যাসও করে দিল। নদী থেকে যখন স্নান করে উঠে এল তখন আর চেনা যায় না সিদ্ধার্থকে—একেবারে নতুন মানুষ।

তখন বিকেল। সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়াল উদ্যানের প্রবেশপথে। কমলা আগের দিনের মতোই এল চতুর্দোলা চড়ে। সিদ্ধার্থ অভিবাদন জানাল, সে-ও তার উত্তর দিল হেসে। দলের সকলের শেষে ছিল যে ভৃত্য, সিদ্ধার্থ ইঙ্গিতে তাকে ডেকে বলল : 'তোমার কর্ত্রীকে বলো একজন ব্রাহ্মণ যুবক দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছে।' একটু পরে ভৃত্য ফিরে এল, সিদ্ধার্থকে লতামণ্ডপে পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

লতামণ্ডপে আরাম করে গা এলিয়ে বসে ছিল কমলা। সিদ্ধার্থকে দেখে প্রশ্ন করল, 'কাল পথে দাঁড়িয়ে তুমিই তো আমাকে নমস্কার করেছিলে?'

'হ্যাঁ, কাল আমিই তোমাকে অভিবাদন জানিয়েছিলাম।'

'কিন্তু কাল তো তোমার মুখ দাড়িতে ঢাকা ছিল, মাথায় ছিল ধুলায় জট পাকানো লম্বা চুল, তাই না?'

'তোমার দৃষ্টিতে কিছুই এড়ায়নি। খুব ভালো করেই লক্ষ করেছ দেখছি। তুমি ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থকে কাল দেখেছ— যে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করেছে এবং যে তিনবছর সন্ন্যাসী হয়ে বনে বনে ঘুরেছে। এখন আমি সন্ন্যাস ত্যাগ

করে এই নগরে এসেছি। নগরে প্রবেশ করার পূর্বে সর্বপ্রথম তোমার সাথে দেখা। কমলা, আমি তোমাকে বলতে এসেছি, তুমিই আমার জীবনে প্রথম স্ত্রীলোক যার সাথে চোখ নত না করে কথা বলছি। সুন্দরী মেয়েদের দেখলে আর কখনো তপস্বীদের মতো দৃষ্টি ভূমিনিবদ্ধ করব না।'

ময়ূরের পালক দিয়ে তৈরি স্বর্ণোজ্জ্বল পাখাটা নিয়ে খেলা করতে করতে একটু হেসে কমলা জিজ্ঞাসা করল, 'শুধু এ-কথা বলতেই সিদ্ধার্থ এসেছে?'

'হ্যাঁ এ-কথা বলতেই এসেছি, আর এসেছি তোমার অপূর্ব সৌন্দর্যের জন্য অভিনন্দন জানাতে। কমলা, তুমি যদি রাগ না কর তাহলে অনুরোধ করব আমাকে তোমার বন্ধু করে নাও। তাছাড়া, তুমি হবে আমার গুরু। যে বিদ্যায় তুমি পারদর্শিনী, সে বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।'

'অরণ্য থেকে সন্ন্যাসী আসবে আমার ছাত্র হতে এ-কথা কখনো কল্পনাও করিনি। মাথাভরা লম্বা চুল নিয়ে এবং পুরনো ছেঁড়া কৌপীন পরে আর কেউ আসেনি আমার সামনে। ব্রাহ্মণকুমার এবং অন্যান্য যুবকরা আমার কাছে আসে মহার্ঘ পোশাক পরে, পায়ে থাকে চমৎকার চকচকে জুতো, তাদের চুলে থাকে সুগন্ধি, আর পেটিকা থাকে অর্থে পূর্ণ। হে সন্ন্যাসী, তরুণরা আমার কাছে এভাবেই আসে।'

সিদ্ধার্থ বলল, 'আমি এর মধ্যেই তোমার কাছ থেকে শিখতে আরম্ভ করেছি। কাল যা শিখেছি তারই ফলে দাড়ি কামিয়েছি, তেল মেখেছি মাথায়, সযত্নে কেশবিন্যাস করেছি। মূল্যবান বস্ত্র, সুন্দর জুতো এবং অর্থ দুষ্প্রাপ্য বস্তু নয়। এর চেয়ে অনেক কঠিন জিনিস তো আমি লাভ করেছি। সে তুলনায় এসব তো তুচ্ছ! কাল যা সংকল্প করেছি তা-ই বা পাব না কেন? তোমাকে দেখেই স্থির করেছি তোমার বন্ধুত্ব লাভ করতে হবে আর তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে প্রেমের কলা। কমলা, তুমি দেখবে আমি উপযুক্ত ছাত্র হব। তোমার কাছ থেকে যা শিখতে চাই তার চেয়ে ঢের কঠিন জিনিস আমি আয়ত্ত করেছি। সিদ্ধার্থের যা সত্য পরিচয় তাতে তুমি সন্তুষ্ট নও; মাথায় তেল মাখলে শুধু চলবে না— চাই পোশাক, পাদুকা, অর্থ।'

কমলা হেসে বলল, 'না, এখনো তুমি যথেষ্ট যোগ্যতা অর্জন করনি। তোমার চাই পোশাক, মহার্ঘ সুন্দর পোশাক; চাই পাদুকা, দামি চমৎকার পাদুকা; চাই প্রচুর অর্থ এবং কমলার জন্য বিবিধ উপহার। কিগো সন্ন্যাসী, এখন জানলে কী কী চাই? বুঝতে পারলে তো?'

'ভালো করেই বুঝেছি', সিদ্ধার্থ বলল। 'তোমার কথা না-বুঝবার তো কারণ নেই। কমলা, তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার দুভাগ করে কাটা তাজা ডুমুরের কথা মনে পড়ে। চেয়ে দেখ, আমার মুখও রক্তিম ও সরস। দেখবে, তোমার মুখের সঙ্গে বেশ মানাবে। কিন্তু, সত্যি করে বলো তো কমলা, বনবাসী যে সন্ন্যাসী তোমার কাছে প্রেমের পাঠ গ্রহণ করতে এসেছে, তাকে দেখে কি একটু ভয় হচ্ছে না?'

'বাহ্! বন থেকে যে নির্বোধ সন্ন্যাসী এসেছে, তাকে ভয় করবার কী আছে? বনে তার সঙ্গী ছিল শেয়ালের দল, মেয়েদের সম্বন্ধে সে কী জানে?'

'ও, তুমি জানো না সন্ন্যাসীরা কত শক্ত, তারা কত নির্ভীক। সুন্দরী, সে

তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করতে পারে, তোমার ধনরত্ন লুণ্ঠন করতে পারে, আর পারে আঘাত করতে।'

'সন্ন্যাসী, আমার ভয় নেই। তোমাদের মনে কি কখনো ভয় হয় যে দস্যু জোর করে তোমার জ্ঞান, ধর্ম ও ধ্যানের শক্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে? তেমন আশঙ্কা হয় না। কারণ, এই গুণগুলি অধিকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সন্ন্যাসীর ইচ্ছা হলেও এর সবটুকু সুধা আদায় করে নিতে পারবে না। কমলার এই সুন্দর রক্তিম ওষ্ঠাধর দেখছ, সুধায় পূর্ণ হয়ে আছে, কিন্তু জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চুম্বন করলে একফোঁটা মধুও পাবে না। সিদ্ধার্থ, তুমি উপযুক্ত ছাত্র, সুতরাং এই তত্ত্বটি শিখে রাখো। জেনে রাখো প্রেম মানুষ ভিক্ষা করে পেতে পারে, পয়সা দিয়ে কেনা যায়, উপহার পাওয়া যেতে পারে, এমনকি পথের ধারে অকস্মাৎ প্রেমের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব নয়—কিন্তু প্রেম চুরি করা যায় না। তুমি ভুল বুঝেছ। তোমাদের মতো সুন্দর যুবকরা ভুল বুঝলে দুঃখের কথা হবে।'

সিদ্ধার্থ ভুল স্বীকার করে হাসল; বলল, 'তুমি ঠিক বলছ কমলা, এটা দুঃখের কথা—খুবই দুঃখের কথা। তোমার অধর থেকে, আমার মুখ থেকে একবিন্দু সুধারও যেন অপচয় না ঘটে। আজ আমার উপযুক্ত বেশভূষা নেই, পাদুকা নেই, অর্থ নেই। এসব যেদিন সংগ্রহ করতে পারব সেদিন আবার তোমার কাছে ফিরে আসব। কিন্তু কমলা, তুমি আমাকে একটু পরামর্শ দেবে?'

'পরামর্শ? কেন দেব না? বনের শেয়ালদের মধ্যে থেকে যে দরিদ্র, অনভিজ্ঞ সন্ন্যাসী লোকালয়ে এসেছে তাকে স্বেচ্ছায় পরামর্শ দিয়ে কে না সাহায্য করবে?'

'কমলা, বল, ওই তিনটি জিনিস যথাসম্ভব শীঘ্র কী করে পেতে পারি?'

'বন্ধু, বহু লোক এই প্রশ্ন করে। তোমার যে বিদ্যা জানা আছে তারই সাহায্যে অর্থ উপার্জন করবে, পোশাক ও পাদুকা কিনবে। দরিদ্রের অন্য পথ নেই।'

'আমি ধ্যান ধরতে পারি, অপেক্ষা করতে পারি, আর পারি উপবাস করতে।'

'আর কিছু নয়?'

'কিছু না। হ্যাঁ, পারি। কবিতা লিখতে পারি। একটি কবিতার বিনিময়ে একটি চুম্বন দেবে?'

'দিতে পারি যদি তোমার কবিতা ভালো লাগে। তোমার কবিতার নাম কী?'

এক মুহূর্ত ভেবে সিদ্ধার্থ আবৃত্তি শুরু করল :

কমলা তার কুঞ্জবনে আসে,
তামাটে শ্রমণ দাঁড়াল দ্বারে।
পদ্মফুল দেখে স্বাগত জানায় মাথা নোয়ায়ে।
কমলা হেসে তা গ্রহণ করে।
শ্রমণ ভাবল, 'এই ভালো, এই ভালো!
দেবতার কাছে আত্মবলির চেয়ে
সুন্দরী কমলার পায়ে আত্মবলিদান শ্রেয়।'

আবৃত্তি শেষ হতেই কমলা হাততালি দিয়ে উঠল; সেই শব্দের সঙ্গে মিশল সোনার বালার নিক্বণ।

'হে পিঙ্গলবর্ণ সন্ন্যাসী, চমৎকার তোমার কবিতা। এ কবিতার বিনিময়ে তোমাকে একটি চুম্বন উপহার দিলে নিশ্চয়ই ঠকতে হবে না।'

চোখের ইঙ্গিতে কমলা তাকে কাছে টেনে আনল। একটি মুখ এল আর একটি মুখের উপর, সিদ্ধার্থ স্পর্শ করল কমলার ওষ্ঠাধর। সিদ্ধার্থ দেখে বিস্মিত হয়ে গেল, কমলার একটি চুম্বন তাকে মুহূর্তের মধ্যে কত শিক্ষা দিয়েছে, প্রেমের বিদ্যায় তার কী নিপুণতা! কমলা তাকে অভিভূত করেছে, বিতৃষ্ণা জাগিয়েছে, প্রলুব্ধ করেছে। সে ভাবতে পারেনি কমলার ওই একটি প্রলম্বিত চুম্বনের পরও তার জন্য অপেক্ষা করেছিল শ্রেণীবদ্ধ আর একটি চুম্বনের মালা; প্রত্যেকটি চুম্বনের স্বাদ আলাদা, অনুভূতি নতুন। একটু সরে এসে দাঁড়াল সিদ্ধার্থ, জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। হঠাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা শিশুর মতো সে চমকে উঠল।

কমলা বলল, 'তোমার কবিতা খুব ভালো লেগেছে আমার। যদি আমার অনেক টাকা থাকত তাহলে তোমাকে এর জন্য মূল্য দিতাম। কিন্তু তুমি যে পরিমাণ টাকা চাও কবিতা লিখে তা পাওয়া বড়ই শক্ত। কমলার বন্ধুত্ব লাভ করতে হলে তোমাকে অনেক টাকা উপার্জন করতে হবে।'

'কমলা, কী অপূর্ব চুম্বনে অভ্যস্ত তুমি।' অস্পষ্ট সুরে থেমে বলল সিদ্ধার্থ।

'হ্যাঁ পারি বলেই তো আমার সাজ-পোশাক, অলঙ্কার আরো কত ভালো ভালো জিনিসের আমি অধিকারী। কিন্তু তুমি এখন কী করবে? ধ্যান, উপবাস ও কাব্যরচনা ছাড়া আর কিছুই কি তুমি পার না?'

'আমি যজ্ঞের গান জানি, কিন্তু সে গান তো আর গাইব না। জাদুমন্ত্রও জানি, সে মন্ত্রও প্রয়োগ করা এখন সম্ভব নয়। শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি।'

'থামো'— কমলা বাধা দিল, 'তুমি লিখতে পড়তে জানো?'

'নিশ্চয়ই জানি। সে তো অনেকেই জানে।'

'আবার অনেকেই জানে না। যেমন আমি। তুমি যে লেখাপড়া জানো এটা সত্যি আশার কথা; খুব ভালো কথা। তোমার হয়তো মন্ত্রতন্ত্র ব্যবহারেরও দরকার হতে পারে।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন ভৃত্য এসে চুপিচুপি কর্ত্রীর কানে কী যেন বলল। কমলা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'সিদ্ধার্থ, আমার একজন অতিথি এসেছে, তুমি তাড়াতাড়ি পালাও এখান থেকে, কেউ যেন দেখতে না পায়। কাল আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

সেই ব্যস্ততার মধ্যেও কমলা ভৃত্যকে আদেশ করল ব্রাহ্মণকে নতুন কাপড় দেবার জন্য। কী ঘটছে ভালো করে বুঝবার আগেই ভৃত্য সিদ্ধার্থকে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে ঘুরিয়ে বাগানবাড়িতে নিয়ে এল। নতুন কাপড় নিয়ে ভৃত্যের নির্দেশ অনুসারে ঝোপঝাড়ের পথে চুপিচুপি উদ্যান পার হয়ে রাজপথে এসে পৌঁছল সে।

নতুন কাপড় বগলদাবা করে পরিতৃপ্ত মনে নগরে ফিরে এল সিদ্ধার্থ। পান্থশালায় পথিকের দল ভিড় করেছে। সিদ্ধার্থ এসে দাঁড়াল এককোণে, নীরবে খাদ্যের প্রার্থনা জানাল। তখনো সন্ন্যাসীর কৌপীন পরে আছে, সসম্মানে আহার্য এনে দেওয়া হল তার সামনে। হয়তো কাল, মনে মনে ভাবল সিদ্ধার্থ, সে ভিক্ষা করে খাবে না।

হঠাৎ আত্মসম্মানবোধ প্রবল হয়ে উঠল। সে তো আর সন্ন্যাসী নয়, ভিক্ষা করা এখন শোভা পায় না। ভাতের থালা কুকুরকে দিয়ে সিদ্ধার্থ অনাহারে থাকল।

সিদ্ধার্থের মনে হল এখানকার জীবনযাত্রা তো বেশ সরল। কোনো জটিলতা নেই। সন্ন্যাসীর জীবন ছিল জটিলতাপূর্ণ, ক্লান্তিকর এবং শেষে তা নিরাশায় কালো হয়ে উঠেছিল। কমলার চুম্বনশিক্ষার প্রথম পাঠের মতো এখানকার জীবন স্বচ্ছন্দপ্রবাহ। এখন আমার চাই অর্থ, চাই সুন্দর বেশভূষা। এ তো আর এমন বেশি চাওয়া নয়, যার জন্য রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে?

নগরে কমলার যে-বাড়ি ছিল সন্ধান করে পরদিন সিদ্ধার্থ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হল।

দূর থেকে দেখতে পেয়েই কমলা ডেকে বলল, 'সুসংবাদ আছে, কামস্বামী তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তার নাম শোনোনি? সে নগরের সবচেয়ে ধনী মানুষ। তাকে প্রসন্ন করতে পারলে চাকরি হবে। তোমার-যে সকল কাজে দক্ষতা আছে আলাপে যেন কামস্বামী তা বুঝতে পারে। আমি লোক মারফত তোমার কথা তাকে বলে পাঠিয়েছি। তার বন্ধুত্ব কামনা করবে, খুব প্রতিপত্তি তার; কিন্তু তাই বলে অতিবিনয়ী হয়ো না। আমি চাই না যে, তুমি কামস্বামীর অনুগত ভৃত্য হয়ে থাকো। তার সমকক্ষ হয়ে চলবে; তা যদি না পার তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হব। কামস্বামীর বয়স যত বাড়ছে ততই সে অলস হয়ে উঠছে। তুমি যদি তাকে সন্তুষ্ট করতে পার তাহলে তোমার ওপরে বিশেষভাবে সে নির্ভর করবে।'

সিদ্ধার্থ হাসিমুখে তাকে ধন্যবাদ জানাল। দুদিন খাওয়া হয়নি শুনে কমলা তাড়াতাড়ি খাবার আনিয়ে যত্ন করে খাওয়াল সিদ্ধার্থকে।

বিদায় নেবার সময় কমলা বলল, 'তোমার ভাগ্য ভালো। একের পর এক তোমার জন্য পথ উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কী করে তা সম্ভব হল? কোনো কবচ-টবচ আছে নাকি?'

সিদ্ধার্থ বলল, 'কাল তো বলেছি আমি জানি চিন্তা করতে, অপেক্ষা করতে ও উপবাস করতে। তুমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছ, এ গুণগুলো নাকি কোনো কাজেই লাগে না। কিন্তু তুমি দেখবে যে এদেরও প্রয়োজন আছে। তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে বনের নির্বোধ সন্ন্যাসীরা অনেক দরকারি জিনিস শেখে। পরশু ভিক্ষুকের অবিন্যস্ত বেশে এসেছিলাম; কালই কমলাকে চুম্বন করবার অধিকার পেয়েছি; এবং শিগগিরই ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করব এবং তোমার কাছে যে-সব জিনিসের মূল্য তা সংগ্রহ করতে পারব।'

কমলা স্বীকার করল; 'ঠিক, কিন্তু আমি না থাকলে তোমার কী দশা হত? আজ কোথায় থাকতে তুমি?

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'তোমার উদ্যানে আসা আমার প্রথম ধাপ। আমার উদ্দেশ্য ছিল শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর কাছ থেকে প্রেমের পাঠ গ্রহণ করব। যে মুহূর্তে এই সংকল্প গ্রহণ করেছি তখনই আমি জানতাম যে আমার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সফল হবে। আমি জানতাম তুমি আমাকে সাহায্য করবে। উদ্যানের প্রবেশপথে তোমার প্রথম কটাক্ষপাত থেকেই তা বুঝেছি!'

'আমি যদি সাহায্য করতে না চাইতাম?'

'কিন্তু তুমি চেয়েছ। শোনো কমলা, পানির মধ্যে ঢিল ছুড়ে মারলে তলদেশে পৌঁছবার দ্রুততম পথটা ঢিল বেছে নেয়। একটা সংকল্প গ্রহণ করলে সিদ্ধার্থের অবস্থাও ঢিলের মতো হয়। সিদ্ধার্থ কিছুই করে না; সে অপেক্ষা করে; ধ্যান করে, আর করে উপবাস; যেমন তলদেশগামী ঢিল পানির মধ্য দিয়ে চলে; সে আকর্ষণ অনুভব করে, বাধা দেয় না, আকর্ষণের পথ ধরে চলতে থাকে। সিদ্ধার্থকে আকর্ষণ করে তার লক্ষ্য; লক্ষ্যে উপস্থিত হবার পরিপন্থী কোনো ভাবনাই সে মনে স্থান দেয় না। সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে সিদ্ধার্থ এই শিক্ষা লাভ করেছে। নির্বোধরা একেই বলে জাদু, তারা মনে করে এরা অসম্ভবকে সম্ভব করে নেয়। কোনো কাজই দানব করে না; কারণ ওদের অস্তিত্ব নেই। প্রত্যেকেই জাদুর খেলা দেখাতে পারে, প্রত্যেকেই লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, যদি সে ধ্যান, প্রতীক্ষা ও উপবাস করতে পারে।'

কমলা নীরবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল তার কথা। সিদ্ধার্থের কণ্ঠস্বর, ভাষা, চোখের স্নিগ্ধ চাউনি বড় ভালো লাগল তার।

মৃদুকণ্ঠে কমলা বলল, 'হয়তো তোমার কথাই সত্য, বন্ধু। আবার অন্য কারণও হতে পারে। হয়তো তুমি রূপবান, তোমাকে দেখে মেয়েরা মুগ্ধ হয় এবং তুমি সৌভাগ্যবান বলেই তোমার পক্ষে সিদ্ধিলাভ সহজ হয়ে ওঠে।'

সিদ্ধার্থ কমলাকে চুম্বন করে বিদায় নিল : 'হে আমার আচার্য, তাই হোক। আমার চোখ যেন তোমাকে চিরদিন আনন্দ দিতে পারে এবং সৌভাগ্যের দান যেন সর্বদা তোমার হাত থেকেই গ্রহণ করতে পারি।'

জনতার কাতারে

কামস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছে সিদ্ধার্থ। বিরাট ঐশ্বর্যমণ্ডিত প্রাসাদ। ভৃত্য পথ দেখিয়ে সুসজ্জিত কক্ষে এনে বসায়। গৃহকর্তার প্রতীক্ষা করতে থাকে সিদ্ধার্থ।

কামস্বামী কামরায় প্রবেশ করল; নধর, প্রাণবন্ত পুরুষ; চুলে শাদার ছোপ লাগতে শুরু হয়েছে; বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ; মুখে লালসার ইঙ্গিত। গৃহস্বামী এবং অতিথি পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ অভিবাদন বিনিময় করল।

শ্রেষ্ঠী বলল, 'আমি শুনেছি আপনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত; কিন্তু বণিকের দপ্তরে চাকরিপ্রার্থী। আপনি চাকরির সন্ধান করছেন কেন? আপনি কি অভাবগ্রস্ত?'

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'না, আমার অভাব নেই; এখনো নেই, পূর্বেও কখনো ছিল না। বহুদিন আমি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বাস করেছি, তাদের মাঝ থেকেই আসছি।'

'সন্ন্যাসীদের সমাজ থেকে যদি এসে থাকেন তাহলে অভাব নেই কীরকম? সন্ন্যাসীরা কি সম্পূর্ণ নিঃস্ব নয়?'

সিদ্ধার্থ বলল, 'জাগতিক অর্থে সত্যি আমার কিছু নেই; কিন্তু আমি রিক্ত হয়েছি স্বেচ্ছায়; সুতরাং আমার অভাববোধ নেই।'

'কিন্তু নিঃস্ব হলে বাঁচবেন কী করে?'

'সে-কথা কখনো ভাবিনি। প্রায় তিন বছর নিঃস্ব অবস্থায় বনে বনে ঘুরে কী করে বাঁচব সে-কথা একবারও ভাবিনি।'

'তাহলে অন্য লোকের সম্পত্তির ওপর জীবন ধারণ করেছেন?'

'ঠিক বলেছেন।' 'কিন্তু বণিক শুধু শুধু অপরের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে না; বিনিময়ে সে দেয় মালামাল।'

'তাই তো নিয়ম। সকলেই দেয়, সকলেই নেয়! জীবনটাই এই দেয়া-নেয়ার কারবার।'

'কিন্তু কিছুই যদি না থাকে, তা হলে দেব কী করে?'

'যার যা আছে সে তো তা-ই দিতে পারে। সৈন্য দেয় শক্তিবল, বণিক পণ্যসম্ভার, আচার্য শিক্ষা, কৃষক চাল এবং জেলে দেয় মাছ।'

'বেশ, কিন্তু আপনি কী দিতে পারেন? এমন কী শিখেছেন যা দান করা সম্ভব?'

'আমি চিন্তা করতে পারি, অপেক্ষা করতে পারি, আর পারি উপবাস করতে।'

'এই কি সব?'

'আমার তো তাই মনে হয়।'

'এদের দিয়ে কী হয়? ধরা যাক, উপবাস; উপবাস কী কাজে লাগে?'

'উপবাসের মূল্য অনেক। খাবার না থাকলে সবচেয়ে বুদ্ধির কাজ হল উপবাস করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, উপবাসের বিদ্যা জানা না থাকলে সিদ্ধার্থকে আজ যে-কোনো চাকরি নিতে হত; ক্ষুধার জ্বালা বাধ্য করত তাকে আপনার দপ্তরে কিংবা অন্য কোথায়ও চাকরি নিতে। কিন্তু সিদ্ধার্থ ধীরভাবে অপেক্ষা করতে পারে। তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি, তার অভাববোধ নেই, ক্ষুধাকে দীর্ঘকাল সে দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, ক্ষুধার সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে পারে। সুতরাং উপবাসেরও প্রয়োজন আছে।'

'তপস্বী, আপনি যথার্থ বলেছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন।' কামস্বামী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে একটা গুটানো কাগজ সিদ্ধার্থের হাতে দিয়ে প্রশ্ন করল, 'এটা পড়তে পারেন?'

সিদ্ধার্থ গুটানো কাগজটা খুলে দেখল ওটা একটা মাল কেনাবেচার চুক্তিপত্র। চুক্তির বিষয় সে পড়ে শোনাতে লাগল।

'চমৎকার!' কামস্বামী শুনে বলল। তারপর সিদ্ধার্থকে একটুকরো কাগজ এবং কলম দিয়ে বলল, 'দয়া করে কিছু লিখে দিন!'

সিদ্ধার্থ কয়েক মুহূর্ত পরেই কাগজ ফিরিয়ে দিল। কামস্বামী পড়ল : 'লেখা ভালো, তারচেয়ে ভালো চিন্তা। নিপুণ বুদ্ধি ভালো, তার চেয়ে ভালো ধৈর্য।'

'চমৎকার লেখা আপনার।' শ্রেষ্ঠী তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। 'পরে আমাদের অনেক কথা আলোচনা হবে। আজ আপনাকে আমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

সিদ্ধার্থ ধন্যবাদের সাথে সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল। শ্রেষ্ঠীর গৃহে শুরু হল তার নতুন জীবন। তার জন্য এল নতুন পোশাক, নতুন পাদুকা। পরিচর্যার জন্য ভৃত্যের দল

সর্বদা কাছে কাছে থাকে। দিনে দুবার সুস্বাদু আহার আসে; কিন্তু সিদ্ধার্থ দিনে শুধু এক বেলা আহার করে; মাংস এবং সুরা স্পর্শ করে না। কামস্বামী ব্যবসা সম্বন্ধে তার সঙ্গে আলোচনা করে; সিদ্ধার্থকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে তার পণ্যসামগ্রী, গুদামঘর এবং হিসাবপত্রের খাতা। সিদ্ধার্থ অনেক জিনিস শিখেছে, শুনেছে অনেক নতুন কথা, কিন্তু নিজে কথা বলেছে কম। কমলার উপদেশ স্মরণ করে সে কখনো শ্রেষ্ঠীর সঙ্গে প্রভুর ন্যায় ব্যবহার করেনি, তাকে দেখেছে সমকক্ষ হিসেবে— হয়তো নিজের চেয়ে একটু ছোট করে। সিদ্ধার্থ অধীনস্থ কর্মচারী, এ-কথা তখনো ভাববার সুযোগ দেয়নি কামস্বামীকে। কামস্বামী ব্যবসা পরিচালনা করত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। এই কাজে ছিল তার গভীর আসক্তি। কিন্তু সিদ্ধার্থের কাছে ব্যবসা ছিল খেলার মতো; খেলার নিয়মগুলো ভালো করে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করত সে, কিন্তু এই ব্যবসার খেলা তার মনে সাড়া জাগাতে পারত না।

অল্পদিনের মধ্যেই সিদ্ধার্থ কামস্বামীর ব্যবসা পরিচালনার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করল। কমলা সময় ঠিক করে দিয়েছিল। চিত্তবিনোদনের জন্য সেই নির্দিষ্ট সময়ে সুন্দর পোশাক পরে, নতুন পাদুকা পায়ে দিয়ে যেত কমলার বাড়ি। ক্রমে হাতে টাকা এল; তখন থেকে কমলার জন্য নিত্যনতুন উপহার নিয়ে যেত। কমলার বিজ্ঞ, রক্তিম অধর থেকে সে শিখল অনেক কথা; কমলার মসৃণ, কমনীয় বাহু তাকে ইঙ্গিত দিল নতুন জগতের। প্রেমের ব্যাপারে সিদ্ধার্থ এখনো অনভিজ্ঞ। অন্ধ অতৃপ্তি নিয়ে সে প্রেমের সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়, দেখতে চায় গভীর তলদেশে কী আছে! কমলা তাকে শেখাল, আনন্দ না দিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না; প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি স্পর্শ, প্রতিটি চাহনি, দেহের প্রতিটি অংশ আনন্দ দেবার গোপন উৎস। সে-ই আনন্দ পাবে যে এই গোপন উৎসের রহস্য জানে। কমলা শিখিয়েছে প্রেমিক-প্রেমিকার শুধু প্রেম করে বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত নয় বরং পরস্পরকে প্রশংসা করতে হয়। কেননা যাতে কারও মনে হতাশার সৃষ্টি না হয় এবং এমন ধারণার সূত্রপাত না ঘটে যাতে কেউ মনে করে বসে যে, তাকে অপব্যবহার করা হয়েছে। দয়িতার নিকট পরাজয় স্বীকার করতে হয়, আবার কখনো বিজয়ীর বেশে তার সামনে উপস্থিত হতে হয়। বৈচিত্র্যের অভাবে প্রেমের মৃত্যু ঘটে। সিদ্ধার্থ তার প্রেমিক, তার বন্ধু, সেই সুন্দরী বীরাঙ্গনার সাহচর্যে অনেক প্রহর কাটিয়েছে। কমলার সাথে প্রণয়সূত্রের মাঝেই সিদ্ধার্থের বর্তমান জীবনের অর্থ ও মূল্য নিহিত আছে—কামস্বামীর ব্যবসায়ে নয়।

বণিক জরুরি চিঠিপত্র ও নির্দেশনামা তার কাছে পাঠিয়ে দিত এবং প্রতিটি জরুরি ব্যাপারে তার সাথে আলাপ-আলোচনায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। সে দেখতে পেয়েছিল, সিদ্ধার্থ চাল, উল, জাহাজ চলাচল ও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সামান্যই শিখেছে; তবে তার একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। মনোযোগসহকারে শ্রবণ করা, অপরিচিত লোকদের মাঝে ভালো ধারণার সৃষ্টি করা, শান্তভাব ও ধৈর্য ধারণে সিদ্ধার্থ তাকেও ছাড়িয়ে গেছে। বণিক এক বন্ধুর কাছে বলেছিল, 'এই ব্রাহ্মণ একজন প্রকৃত ব্যবসায়ী নয় এবং কখনো ব্যবসায়ী হতে পারবে না। সে ব্যবসায়ে মনোযোগ দিতে পারেনি। তবে তার এমন গুণাবলি আছে, যেগুলো স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই সাফল্য নিয়ে আসবে তা সে জন্মগত

ভাগ্যরাশির কারণেই হোক অথবা অলৌকিক কারণেই। নতুবা শ্রমণদের কাছে এই সাফল্যের মন্ত্র সে শিখে নিয়েছে। তার ভাবটা এমন যে সে যেন ব্যবসা নিয়ে খেলা করছে, এ তার মাঝে কখনো গভীরভাবে রেখাপাত করছে না। সেটাকে সে জয়ও করেনি। অবশ্য ব্যর্থতাকে সে ভয় করে না; লোকসানে সে মোটেই চিন্তিত হয় না।'

বন্ধু কামস্বামীকে উপদেশ দিল, 'তোমার ব্যবসা যারা দেখাশোনা করে লাভের এক-তৃতীয়াংশ তাদের দাও; অবশ্য লোকসান হলে আনুপাতিক হারে ক্ষতির দায়দায়িত্বও তাদের নিতে হবে। এমনি করে লাভ-লোকসানের সাথে প্রত্যক্ষ জড়িয়ে পড়লে ব্যবসা সম্পর্কে সে উৎসাহী হয়ে উঠবে।'

কামস্বামী বন্ধুর উপদেশ অনুসারে কাজ করল। কিন্তু সিদ্ধার্থের মনে কোনো পরিবর্তন ঘটল না। যদি লাভ হয় তবে লাভের অংশ গ্রহণ করে, উচ্ছ্বসিত হয় না, লোকসান হলেই-বা কী? শুধু হেসে বলে, 'এই যাহ্ এবারের লেনদেন তেমন ভালো হল না।'

সত্যিই ব্যবসায়ে তার মন ছিল না। একবার সে এক গ্রামে চাল কিনতে গেল। কিন্তু সিদ্ধার্থ সেখানে পৌঁছবার আগেই অন্য এক বণিক সব চাল কিনে নিয়েছে। তবু সিদ্ধার্থ কয়েকদিন থেকে গেল সেই গ্রামে। সিদ্ধার্থ গ্রামের কৃষকদের ডেকে ভোজ দিল, গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পয়সা বিতরণ করল, একটা বিয়ের নিমন্ত্রণও খেল, তারপর খুশিমনে শহরে ফিরে এল। কামস্বামী তিরস্কার করল, সে কেন তক্ষুণি ফিরে আসেনি; চাল কেনা হবে না জেনেও কেন গ্রামে বসে থেকে সে মিছামিছি অর্থ ও সময়ের অপব্যয় করেছে? সিদ্ধার্থ উত্তর দিল : 'বন্ধু, তিরস্কার কোরো না। গালাগালের দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না। যে লোকসান হয়েছে তার দায় আমার একার। এবারকার সফরটা আমার বেশ ভালো লেগেছে। কত লোকের সাথে পরিচয় হল, একজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল; গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আপন লোক মনে করে আমার কোলে এসে বসত। কৃষকরা তাদের ফসলভর্তি জমি আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে, কেউ আমাকে ব্যবসায়ী মনে করে দূরে সরিয়ে দেয়নি।'

একটু বিরক্ত হয়ে কামস্বামী বলল, 'খুব ভালো কথা; কিন্তু তুমি যে বণিক সে- কথা তো অস্বীকার করতে পার না— ব্যবসার জন্য বেরিয়েছিলে না প্রমোদভ্রমণ ছিল তোমার উদ্দেশ্য?'

'নিশ্চয়ই আনন্দের জন্য ভ্রমণ করেছি', সিদ্ধার্থ হেসে বলল। 'কেন নয়? আমি নতুন অঞ্চল দেখার সুযোগ পেলাম, অনেক নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় হল, তাদের বন্ধুত্ব লাভ করেছি, তারা আমাকে আপনার লোক বলে গ্রহণ করেছে। আর আমি কামস্বামী হলে চাল কিনতে না-পারার দুঃখে তখনই ফিরে আসতাম, এবং সময় ও অর্থ সত্যি হারিয়ে যেত। কিন্তু আমি কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়েছি, তাই শিখেছি অনেককিছু। কত আনন্দ পেয়েছি; কিন্তু ব্যর্থতার ক্ষোভে কিংবা অশোভন ব্যবহারের জন্য নিজেকে অথবা অন্য কাউকে দুঃখ দিইনি। হয়তো পরবর্তী ফসলের চাল কিনতে কিংবা অন্যকোনো কারণে আবার সেখানে গেলে বন্ধুদের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা পাব। তখন এই ভেবে আমি তৃপ্তি পাব যে, প্রথমবার এসে ব্যস্ততা ও অসন্তোষ প্রকাশ

করিনি। যাই হোক, এ ব্যাপারে আলোচনা এখানেই শেষ হোক। আমাকে তিরস্কার করে তুমি দুঃখ পেও না। যদি কোনোদিন তোমার মনে হয়, সিদ্ধার্থ তোমার ক্ষতি করছে, তখন শুধু সেই কথাটি আমাকে জানিয়ে দিও; আমি আমার পথে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু সেদিন না আসা পর্যন্ত আমাদের অন্তরঙ্গতায় যেন ভাটা না পড়ে।'

শ্রেষ্ঠী কিছুতেই সিদ্ধার্থকে বোঝাতে পারত না যে সে কামস্বামীর ভাত খাচ্ছে। সিদ্ধার্থ বলত সে নিজেরটাই খাচ্ছে; তারা দুজনেই অপরের অন্নে ভাগ বসাচ্ছে না; প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাগ গ্রহণ করছে। কামস্বামীর ঝামেলার শেষ ছিল না। কিন্তু সিদ্ধার্থ কখনো নিজেকে তার সঙ্গে জড়াত না। একটি লেনদেন ব্যর্থ হবার আশঙ্কা দেখা দিলে, একটা চালানে ক্ষতি হলে দেনাদারকে ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ দেখলে ক্রুদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করে, কপালের বলিরেখা স্পষ্ট করে, রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে যে ফল পাওয়া যায়, কামস্বামী সিদ্ধার্থকে তা কিছুতেই বোঝাতে পারেনি; সে কামস্বামীর কাছ থেকেই সবকিছু শিখেছে, এ-কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'এমন পরিহাস কোরো না। তোমার কাছ থেকে শিখেছি এক ঝুড়ি মাছের দাম কত, টাকা ধার দিলে সুদের হার কত হবে—এইসব! তোমার বিদ্যা তো এই। কিন্তু বন্ধু, কী করে গভীরভাবে চিন্তা করতে হয় তা তোমার কাছ থেকে শিখিনি। এই বিদ্যাটা তুমি আমার কাছ থেকে শিখে নিলে ভালো করতে।'

সত্যি ব্যবসায়ে তার মন ছিল না! কমলার জন্য টাকা প্রয়োজন, তাই সে আছে এই কাজে; প্রয়োজনের অধিক টাকা আসে তার হাতে। তা ছাড়া সংসারের বিচিত্র মানুষদের সম্বন্ধে সিদ্ধার্থের ছিল সহানুভূতি ও কৌতূহল। এতদিন এদের জীবনযাত্রা, আনন্দ-বেদনা, দোষত্রুটি তার কাছে আকাশের চাঁদের চেয়েও দূরের বস্তু ছিল। যদিও সকলের সাথেই সে অতি সহজে আলাপ করতে ও বাস করতে পারত, তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন কথা শিখতে পারত, তবু সম্পূর্ণ মিলন ঘটত না, কোথায় যেন ফাঁক থেকে যেত। সিদ্ধার্থ বুঝতে পারত সন্ন্যাস জীবনের অভিজ্ঞতাই এর কারণ। আজ সে দেখে লোক কখনো শিশুর মতো, কখনো-বা পশুর মতো আচরণ করছে। সিদ্ধার্থ তাদের ভালোবাসে, আবার ঘৃণা করে। সে দেখে তারা কঠোর পরিশ্রম করছে; অর্থ, তুচ্ছ সুখ, তুচ্ছ সম্মান লাভের জন্য কত দুঃখ ভোগ করে, বার্ধক্যে নুয়ে পড়ে, অথচ এসব আকাঙ্ক্ষার বস্তু সিদ্ধার্থের চোখে মূল্যহীন! সিদ্ধার্থ দেখে তারা পরস্পরকে গালি দেয়, আঘাত করে। সংসারী লোক যেসব বেদনায় বিলাপ করে, সন্ন্যাসীরা তা হেসে উড়িয়ে দেয়; সিদ্ধার্থ লক্ষ করে যে পাপের ফলেই এরা দুঃখভোগ করছে, সন্ন্যাসীদের তা স্পর্শও করতে পারে না।

সিদ্ধার্থের কাছে সব লোকের ছিল অবারিত দ্বার। যে বণিক কাপড় বিক্রয় করতে আসত, যে দেনাদার ঋণপ্রার্থী, তাদের সমানভাবেই সে অভ্যর্থনা করত। আবার ভিক্ষুককেও সে কাছে ডেকে বসাত, একঘণ্টা ধরে তার দারিদ্র্যের কাহিনী শুনত, অথচ ভিক্ষুকও সন্ন্যাসীদের মতো নিঃস্ব নয়। যে নাপিত তার দাড়ি কামায়, যে ফেরিঅলার কাছ থেকে সে কলা কেনে এবং যাকে জেনেশুনেই দু-এক পয়সা ঠকাতে দেয়, এবং যে বিত্তশালী বিদেশি শ্রেষ্ঠী ব্যবসা উপলক্ষে অতিথি হয়ে আসে—প্রত্যেকের সাথেই

সিদ্ধার্থ সমান ব্যবহার করে। কামস্বামী যখন তার দুঃখের কথা বলতে আসে, যখন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজের বিরূপ সমালোচনা করে তা-ও সিদ্ধার্থ মন দিয়ে শোনে; কামস্বামীর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়, তাকে বুঝতে চেষ্টা করে, যেখানে প্রয়োজন তার কথা একটু স্বীকার করে নেয়, তার পরেই সে আলাপ শুরু করে অন্য কোনো একজন সাক্ষাৎপ্রার্থীর সঙ্গে। তার কাছে অনেক লোক আসে— কেউ ব্যবসার জন্য, কেউ প্রতারণা করতে, কেউ তার কথা শুনতে, কেউ সহানুভূতি লাভ করতে, কেউ-বা উপদেশ নিতে। সিদ্ধার্থ কাউকে উপদেশ দিত, কারো দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করত, কাউকে দিত উপহার, আবার তাকে একটু ঠকাবার সুযোগ করে দিত হয়তো কোনো লোককে। একদিন দেবতা ও ব্রহ্ম তার মন যেমন অধিকার করেছিল তেমনি মানুষ নিয়ে এই বিচিত্র খেলায় সিদ্ধার্থ ডুবে থাকে, ভালো লাগে, নতুন লাগে এই খেলা।

কখনো কখনো সিদ্ধার্থ নিজের মধ্যে একটি মৃদুকোমল স্বর শুনতে পায়; কী যেন তাকে ধীরে ধীরে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, কিসের বিরুদ্ধে যেন অভিযোগ করছে। কিন্তু এত মৃদু সেই স্বর যে শোনা যায় না। হঠাৎ সে স্পষ্ট করে এর অর্থ উপলব্ধি করতে পারল, যে জীবন সে যাপন করছে সে জীবন তার কাছে অচেনা; কত কাজ করছে শুধু খেলার ছলে। প্রকৃত জীবনের ধারা বয়ে যাচ্ছে দূর দিয়ে—তার ছোঁয়ার বাইরে। খেলোয়াড় যেমন বল নিয়ে খেলা করে, সিদ্ধার্থও তেমনি খেলা করছে ব্যবসা নিয়ে, চারপাশের লোকদের নিয়ে। সে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করে, আমোদ পায়, কিন্তু মন নেই এসবের মধ্যে তার। প্রকৃত সত্তা নেই এখানে। তার আত্মা, তার আসল সত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্য কোথাও—অনেক দূরে, অদৃশ্য হয়ে কেবল ঘুরছে আর ঘুরছে, যোগ নেই বর্তমান জীবনের সাথে। এই ভাবনা মাঝে মাঝে তাকে ভীত করেছে। এর চেয়ে ভালো হত যদি জীবনের খেলায় শিশুর মতো সকল আগ্রহ নিয়ে মত্ত হয়ে যেতে পারত, যদি সংসারের কাজকর্মে সত্যি সত্যি আনন্দ পেত। শুধু দর্শক না হয়ে সংসারের আর পাঁচজনের মতো জীবনকে উপভোগ করা সম্ভব হত!

সিদ্ধার্থ নিয়মিত কমলার বাড়ি যায়। শিখেছে প্রেমের কলা; দান-প্রতিদান যে-প্রেমে এক হয়ে মিশে যায়, সেই প্রেমের বিদ্যা। সিদ্ধার্থ তার সাথে গল্প করে, নতুন কথা শেখে, কমলাকে উপদেশ দেয়; গ্রহণ করে কমলার উপদেশ। একদিন গোবিন্দ তাকে যতটা বুঝতে পারত কমলা তার চেয়ে তাকে বেশি বুঝতে পারে। কমলা অনেকটা যেন তারই মতো।

সিদ্ধার্থ একদিন বলল, 'কমলা, তোমার মধ্যে দেখতে পাই আমার ছায়া। তুমি আর কারো মতো নও; তুমি শুধুই কমলা, তুমি অনন্যা। তোমার মনের এককোণে আছে গভীর প্রশান্তি, আর আছে একটি মন্দির, যখনই নিজেকে নিয়ে একটু একা থাকতে চাও তখনই প্রবেশ কর সেই মন্দিরে। ঠিক আমার মতো। খুব কম লোকের এই ক্ষমতা আছে, অথচ প্রত্যেকেই তা লাভ করতে পারে।'

কমলা বলল, 'সব লোকের বুদ্ধি তো সমান নয়!'

'বুদ্ধির সঙ্গে এর যোগ নেই, কমলা।' সিদ্ধার্থ উত্তর দিল। 'বুদ্ধিতে কামস্বামী আমার সমকক্ষ, কিন্তু তার মনের কোণে মন্দির নেই। আবার কত লোক আছে যারা বুদ্ধিতে

শিশুর মতো সরল। বলা যায়, অধিকাংশ লোকই ঝরাপাতার মতো হাওয়ায় উড়ে যায়, ভেসে বেড়ায় কিছুক্ষণ, তারপর মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। কিন্তু অল্প কয়েকজন আছেন যাঁরা আকাশের নক্ষত্রের মতো নির্দিষ্ট কক্ষপথে চলেন; পৃথিবীর হাওয়া সেখানে পৌঁছে না, তাদের পথ এবং পথপ্রদর্শক আছে তাঁদেরই অন্তরে। আমি অনেক জ্ঞানীলোক দেখেছি, তাঁদের সকলের মধ্যে একজন এ ব্যাপারে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর কথা কখনো ভুলব না। তিনি মহাভিক্ষু গৌতম। তিনি ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন তাঁর ধর্মমত। প্রতিদিন হাজার হাজার তরুণ তাঁর উপদেশ শোনে, প্রতি ঘণ্টায় পালন করে তাঁর নির্দেশ; কিন্তু এই তরুণরা তো ঝরাপাতার দল; পথ চলবার জ্ঞান ও নির্দেশ নেই তাদের অন্তরে।'

কমলা তার চোখের ওপর চোখ রেখে হেসে বলল, 'আবার তুমি তাঁর কথা বলছ। শ্রমণজীবনের ভাবনা আবার তোমাকে পেয়ে বসেছে।'

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না। শুরু হল প্রেমের খেলা। কমলা যে ত্রিশ-চল্লিশটি খেলা জানত তারই একটি। শিকারির ধনুকের মতো, জাগুয়ারের মতো নমনীয় কমলার দেহ। তার কাছ থেকে যারা প্রেম সম্বন্ধে জানতে আসত, তারা পেত অনেক আনন্দ, জেনে যেত অনেক গোপন কথা। অনেকক্ষণ সিদ্ধার্থের সাথে সে খেলা করল, তাকে বাধা দিল, অভিভূত করল, জয় করল; আর সে জয়ের আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে, পরাজিত, অবসন্ন সিদ্ধার্থ পড়ে রইল কমলার পাশে।

কমলা ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল সিদ্ধার্থের ক্লান্ত মুখের দিকে। তারপর চিন্তিত সুরে বলল, 'তুমি আমার শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। এমন আর পাইনি কাউকে। তুমি সকলের চেয়ে বীর্যবান, তোমার দেহ-মন দুইই নমনীয়। সিদ্ধার্থ, আমার বিদ্যা তুমি ভালো করেই শিখেছ। একদিন যখন বয়স বাড়বে, তোমার ছেলে যেন আসে আমার কোলে। এত প্রেমের খেলা, তবু প্রিয়তম তুমি শ্রমণই রয়ে গেছ। তুমি সত্যি আমাকে ভালোবাস না—কাউকে ভালোবাস না। একি সত্যি নয়?'

'হয়তো সত্যি', শান্তকণ্ঠে সিদ্ধার্থ জবাব দিল। 'আমি তো তোমার মতোই। তুমিও কাউকে ভালোবাস না, যদি বাসতে, তাহলে প্রেমকে কলা হিসেবে কী করে অভ্যাস করা সম্ভব? হয়তো আমাদের মতো লোকেরা কখনো ভালোবাসতে পারে না। সাধারণ লোকেরা পারে, সেটাই তাদের মন্ত্রগুপ্তি।'

সংসার

নিজে সংসারী না হয়েও দীর্ঘকাল সিদ্ধার্থ সংসারে বাস করেছে। কঠোর সন্ন্যাসজীবনে নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় যে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ভোঁতা করে ফেলেছিল আবার জেগে উঠছে তারা। অর্থ, প্রেম, ক্ষমতা এ জীবনে মানুষের যা একান্ত কাম্য, সবই সে উপভোগ করেছে। তবু অন্তরে সে এখনো সন্ন্যাসী। বুদ্ধিমতী কমলা দেখতে পেয়েছে তার এই সন্ন্যাসীর রূপ। সিদ্ধার্থের জীবন চিন্তা, প্রতীক্ষা ও উপবাসের নীতি দিয়েই পরিচালিত হয়। চারপাশের সাধারণ লোক সিদ্ধার্থের চোখে এখনো অপরিচিত; এদের জীবনকে সে এখনো যেন ভালো করে বুঝতে পারে না। তার নিজের জীবনও বোধহয় ঠিক তেমনি

দুর্বোধ্য রয়ে গেছে ওদের কাছে।

বছরের পর বছর পার হয়ে গেল। স্বচ্ছন্দ জীবনের আরামে ডুবে থেকে সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল না কালপ্রবাহের গতি। এখন সে বিত্তশালী; নিজে বাড়ি করেছে, ইঙ্গিতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে অনুচরের দল। শহরের বাইরে নদীতীরে গড়ে তুলেছে মনোরম উদ্যান। লোকে পছন্দ করে তাকে; অর্থের প্রয়োজন হলে কিংবা উপদেশ দরকার হলে তারা সিদ্ধার্থের কাছে আসে। কিন্তু একমাত্র কমলা ছাড়া তার অন্তরঙ্গ বন্ধু কেউ নেই।

প্রথম যৌবনে গৌতমের ধর্মোপদেশ এবং গোবিন্দের বিচ্ছেদ-বেদনা তার মধ্যে যে মহান জাগরণ এনে দিয়েছিল, তার সেই সদাজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা, সকল গুরু এবং প্রচলিত ধর্মমত ত্যাগ করে নিজের পায়ে একাকী দাঁড়াবার সেই পর্ব, নিজের অন্তরে পরম ব্রহ্মের প্রকাশের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ, সব ধীরে ধীরে শুধুই স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে, হয়তো-বা একেবারেই ভুলে গেছে। ঈশ্বর-প্রেরণার যে উৎস সে সর্বদা অনুভব করত, যে প্রেরণার সঙ্গীত তার অন্তর মুখরিত করে তুলত; আজ সে সঙ্গীতের অস্পষ্ট রেশ ভেসে আসে বহুদূর থেকে। গৌতম, শ্রমণ, ব্রাহ্মণ এবং তার পিতার কাছ থেকে সিদ্ধার্থ শিখেছে অনেক কথা, শিখেছে সংযমের উপকারিতা, জেনেছে ধ্যানের আনন্দ, উপলব্ধি করেছে অহং ও অবিনশ্বর আত্মার গূঢ়তত্ত্ব। এসব শিক্ষার অনেককিছু এখনো রয়েছে তার মধ্যে; আবার কিছু কিছু ডুবে গেছে সংসারের চাপে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতার ধুলায় ঢাকা পড়েছে। কুমারের চাকা যেমন একবার ঘুরিয়ে দিলে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরতে থাকে, ক্রমশ গতি কমে আসে, তারপর একেবারে থেমে যায়—তেমনি সন্ন্যাসের চাকা, চিন্তার চাকা, বিচারের চাকা এখনো ঘুরছে সিদ্ধার্থের অন্তরে। কিন্তু সে চাকার গতি শ্লথ, ঘুরছে থেমে থেমে, একেবারে স্থির হয়ে যাবার সময় এসেছে। মুমূর্ষু গাছের গুঁড়িতে আর্দ্রতা ঢুকে যেমন সর্বত্র ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, শক্ত কাঠ আস্তে আস্তে পচে ওঠে, তেমনি কোনো এক অলক্ষ্য ছিদ্রপথে সংসার ও জড়ত্ব প্রবেশ করেছে সিদ্ধার্থের অন্তরে; ধীরে ধীরে তার আত্মা ভারী হয়ে উঠেছে, শান্ত হয়ে পড়েছে--যেন ঘুম পেয়েছে। অপরপক্ষে তার ইন্দ্রিয়ানুভূতি আরো তীব্র হয়েছে, শিখেছে অনেক নতুন জিনিস, প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছে।

সিদ্ধার্থ ব্যবসা পরিচালনা শিখেছে, লোকের ওপর সে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, নারীসঙ্গ থেকে আনন্দ পায়। এখন সিদ্ধার্থ বহুমূল্যবান পোশাক পরিধান করে, ভৃত্যদের আদেশ করে, সুগন্ধি পানিতে গোসল করে। উপাদেয় আহার খেতে শিখেছে; মাছ, মাংস ও নানাবিধ উপাদেয় ভোজ্য আজকাল তার খাদ্যতালিকায় স্থান পেয়েছে; সে পান করে সুরা—যে সুরা মধুর অবসাদ আনে, মনের ওপর বুলিয়ে দেয় বিস্মরণের প্রলেপ। সিদ্ধার্থ দাবা ও পাশাখেলা শিখেছে; এখন সে যায় নাচের আসরে, পালকি চড়ে বেড়ায়, কোমল শয্যায় শুয়ে নিদ্রার সাধনা করে। তবু সিদ্ধার্থ নিজেকে সংসারের জনপ্রবাহ থেকে পৃথক মনে করে, মনে মনে অনুভব করে তার স্থান এদের ঊর্ধ্বে। সে এদের সর্বদাই একটু অবহেলার চোখে দেখে—শ্রমণরা যেমন অবজ্ঞা করে সংসারী লোকদের। কামস্বামীর যখন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, যখন সে অপমানিত বোধ করে, ব্যবসা

সম্পর্কিত ব্যাপারে যখন বিচলিত হয়, তখন সিদ্ধার্থ কৌতুক অনুভব করে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ও অলক্ষ্যে সেই বিদ্রূপ ও উচ্চমনোভাবের ভাব হ্রাস পেল। ক্রমশ সম্পত্তি বাড়ার সঙ্গে সিদ্ধার্থও সাধারণ সংসারী লোকের কতগুলো বৈশিষ্ট্য লাভ করল; কোনো কোনো ব্যাপারে তার চরিত্রেও দেখা দিল ছেলেমানুষি, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তারও শুরু হল দুর্ভাবনা। তবু সিদ্ধার্থ ঈর্ষা করত সাধারণ লোকদের; যতই সে তাদের কাছে আসে তার ঈর্ষাও ততই বৃদ্ধি পায়। ওদের যা আছে সিদ্ধার্থের তা নেই; সে-ই ঈর্ষার কারণ। এরা জীবনের ওপর যে গুরুত্ব আরোপ করে, এদের আনন্দ ও বেদনায় যে গভীরতা আছে, ভালোবাসায় যে উৎকণ্ঠা ও আনন্দ আছে, সিদ্ধার্থের তা নেই। সংসারী লোকেরা নিজেদের ও সন্তানসন্ততিকে ভালোবাসে, ডুবে থাকে সেই ভালোবাসায়; অর্থ ও সম্মানের মোহ তাদের প্রলুব্ধ করে, মুগ্ধ হয় ভবিষ্যতের রঙিন আশায়। কিন্তু হায়, সিদ্ধার্থ তাদের কাছ থেকে শিখতে পারেনি এই শিশুসুলভ আনন্দ ও ভুলভ্রান্তির রহস্য; শিখেছে এমন সব জিনিস যা সে ঘৃণা করে। কত রাত্রি স্ফূর্তিতে কাটিয়ে পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে থাকে সে; শান্তিতে ও বিষাদে দেহ ও মন পূর্ণ হয়ে যায়। কামস্বামী তার ঝামেলার কাহিনী বলতে এলে সিদ্ধার্থ বিরক্ত ও অধৈর্য হয়। পাশাখেলায় হার হলে মাত্রাহীন উচ্চকণ্ঠে সে হাসতে আরম্ভ করে। এখনো সিদ্ধার্থের চোখেমুখে বুদ্ধির দীপ্তি ঝকঝক করছে; এ দীপ্তি আর কারো নেই। কিন্তু সে হাসি বিরল। ক্রমশ সিদ্ধার্থের মুখভাব আর পাঁচজন ধনীব্যক্তির মতোই হয়ে উঠল। তেমনি অসন্তোষ, অসুস্থতা, বিরক্তি, আলস্য ও প্রীতিহীনতা ফুটে উঠল তার মুখে। ধীরে ধীরে ধনীসুলভ রোগ তার মনেও অনুপ্রবেশ করল।

অবগুণ্ঠনের মতো, পাতলা কুয়াশার পর্দার মতো, শ্রান্তি আচ্ছন্ন করেছে সিদ্ধার্থকে। দিনে দিনে সেই গুণ্ঠন গাঢ় হচ্ছে, মাসে মাসে তা অস্বচ্ছ হয়ে উঠছে, বছরের পর বছর আরো পুরু হয়ে চলেছে। নতুন পোশাক যেমন সময়ের সাথে সাথে পুরোন হয়, তার উজ্জ্বল রঙ হারিয়ে যায়, তাতে দাগ লাগে, ভাঁজ পড়ে, ঘুড়ি ছিঁড়ে যায়, এখানে ওখানে সূতা ওঠে—তেমনি গোবিন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সিদ্ধার্থ যে নতুন জীবন আরম্ভ করেছিল, তা আজ জীর্ণ হয়ে গেছে। হারিয়ে যাওয়া বছরগুলো এই জীবনের সকল রঙ ও চাকচিক্য একে একে চুরি করে নিয়ে গেছে, শুধু জমে উঠেছে মলিন দাগ। মনের এক গোপন কোণে ঘৃণা ও ভুল-ভাঙার বেদনা বুঝি উঠতে চায় মাথাচাড়া দিয়ে; দু-এক সময় তা প্রকাশও হয়ে পড়ে, তবু সিদ্ধার্থ এ সম্বন্ধে এখনো সচেতন নয়। সিদ্ধার্থ শুধু লক্ষ করেছে, একদিন যে আনন্দোৎফুল্ল, সুস্পষ্ট স্বর তার হৃদয় থেকে পথনির্দেশ করেছে, আজ সেই স্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে।

সংসার দুই বাহু দিয়ে সিদ্ধার্থকে জড়িয়ে ধরেছে। সে আজ তুচ্ছ সুখ, লোভ ও আলস্যের হাতে বন্দি। যে অর্জনের স্পৃহাকে সে একদিন ঘৃণা করত নির্বুদ্ধিতার লক্ষণ বলে, আজ সেই পাপও স্পর্শ করেছে তাকে। শেষপর্যন্ত অর্থ ও সম্পত্তির ফাঁদে সে বাঁধা পড়েছে; এরা আজ আর খেলা ও খেলনা নয়, হয়েছে বোঝা, শৃঙ্খল। পাশাখেলার সহায়তায় অর্থোপার্জনের নিম্নগামী আঁকাবাঁকা পথ ধরে চলছে সিদ্ধার্থ। সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ যখন প্রথম এল সংসারে, তখন সে পাশা খেলেছে

সাধারণ লোকের রীতি হিসেবে। খেলেছে শিথিলভাবে, পেয়েছে হালকা আনন্দ। এখন পাশা খেলে টাকার লোভে, অর্থের মোহে। খেলায় ক্রমশ আগ্রহ বাড়ছে। সিদ্ধার্থ অজেয় খেলোয়াড়, বেপরোয়া। এত অধিক বাজি রাখে যে তার সঙ্গে কেউ পাশা খেলতে সাহস করে না। অন্তরের তাগিদে সে খেলতে বসে। যে অর্থ তার ওপর মোহ বিস্তার করেছে, জুয়া খেলে সেই অর্থ উড়িয়ে দিতে গভীর তৃপ্তি পায় সিদ্ধার্থ। আর কোনো উপায়েই অর্থের ওপর তার বিদ্রূপমিশ্রিত অবজ্ঞাকে এমন স্পষ্ট করে দেখাবার সুযোগ নেই। ব্যবসায়ীদের মেকি দেবতা এই অর্থকে সুযোগ পেলেই সে অপমান করে; মোটা অঙ্কের বাজি ধরে; টাকার ওপর লোভ দেখে নিজেকে ঘৃণা করে, বিদ্রূপের কুটিল হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। সে জিতেছে হাজার হাজার টাকা, ছড়িয়ে দিয়েছে হাজার হাজার; অর্থ হেরেছে, মণিমুক্তা হেরেছে, হেরেছে তার বাগানবাড়ি; আবার সব জিতেছে, জিতেছে আর একবার হারাবে বলে। সিদ্ধার্থের ভালো লাগত সেই উৎকণ্ঠা—যে তীব্র ক্লেশকর উৎকণ্ঠা তাকে অভিভূত করে ফেলত পাশাখেলার মোটা অঙ্কের বাজির অনিশ্চয়তায়। এই অনুভূতির অভিজ্ঞতা ভালোবাসত সিদ্ধার্থ; তার পরিতৃপ্ত, কবোষ্ণ, বিস্বাদময় জীবনে একমাত্র পাশাখেলা নিয়ে আসত উচ্ছলতা; পণ রেখে খেলবার উৎকণ্ঠার মধ্যে এখনো কিছু সুখ পায়, পায় উত্তেজনা; তাই বারবার সে ফিরিয়ে আনতে চায় জুয়াড়ির উৎকণ্ঠা—তাকে তীব্রতর করে তোলে, প্ররোচিত করে। খেলায় বড় রকম হার হলে সে আত্মনিয়োগ করে অর্থ উপার্জনের নতুন চেষ্টায়, ব্যগ্র হয়ে ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে; খাতকদের ওপর চাপ দেয় দেনা শোধ করার জন্য। আবার সে খেলতে চায়; তার টাকার প্রয়োজন; আবার সে টাকা উড়িয়েও দিতে চায়; দেখাতে চায় অর্থকে সে কত ঘৃণা করে।

আজকাল লোকসান হলে সিদ্ধার্থ অস্থির হয়ে পড়ে, দেনাদার ঋণ শোধ করতে শৈথিল্য করলে অধৈর্য হয়ে ওঠে, ভিক্ষুকের ওপর আর দয়া নেই, দরিদ্রকে ধার দেবার অথবা কিছু দান করবার মনোবৃত্তি হারিয়ে গেছে। যে সিদ্ধার্থ একদিন দশ সহস্র মুদ্রা পণ রেখে হাসতে হাসতে পাশার দান ফেলেছে, সে আজ ব্যবসায়ের ব্যাপারে রূঢ় ও নীচ হয়ে উঠেছে। আরো আশ্চর্য, কখনো কখনো রাতে সে স্বপ্ন দেখে ধনরত্নের। সেই ঘৃণিত স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে চোখ পড়ে দেয়ালের আয়নায়, কী বিশ্রী দেখায় তার মুখ! বার্ধক্যের কুশ্রী ছায়া পড়েছে তাতে। নিজের মুখের প্রতিবিম্ব লজ্জা ও ঘৃণায় তাকে অভিভূত করে। ঐ ছায়া থেকে, নিজের কাছ থেকে, পালিয়ে যায় সে দ্রুত—প্রবৃত্তির ঘূর্ণাবর্তে, সুরার নেশায়। কিন্তু সে পলায়ন কিছুক্ষণেরই, আবার অর্থ উপার্জন ও সঞ্চয়ের তাগিদ তার মনে জেগে ওঠে। এই নিরর্থক আকর্ষণ-বিকর্ষণের বৃত্তি সিদ্ধার্থের জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করছে, দিনে দিনে সে বৃদ্ধ ও পীড়িত হয়ে উঠছে।

তারপর একদিন স্বপ্ন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল। কমলার মনোরম প্রমোদ-উদ্যানে বিকেল কাটাতে এসেছে সে। গাছের তলায় বসে কথা বলছে কমলার সাথে। কমলার কণ্ঠস্বর গম্ভীর, প্রতিটি কথার পশ্চাতে শ্রান্তি ও বেদনা প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কমলা শুনতে চায় গৌতমের কথা। কী স্বচ্ছ তাঁর দৃষ্টি, কী প্রশান্ত-মধুর তার মুখ; তাঁর হাসিতে কী করুণা, তাঁর সকল কথায় ও কাজে কী গভীর শান্তি! কতবার এসব শুনেছে সিদ্ধার্থের

মুখে, তবু তৃপ্তি নেই, আরো শুনতে চায় সে। বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধার্থ বলল বুদ্ধের কাহিনী; কমলা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলল : 'হয়তো শিগগিরই একদিন আমি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করব। এই প্রমোদ-উদ্যান তাঁকে দান করে তাঁর কাছে দীক্ষা নেব আমি।' কিন্তু পরমুহূর্তেই কমলা সিদ্ধার্থকে প্রলুব্ধ করল; প্রেমের খেলায় ব্যগ্র ও উত্তপ্ত আলিঙ্গনে বন্দি করল প্রেমাস্পদকে, আবেগের প্রচণ্ডতার সঙ্গে মিশে গেল তার চোখের অশ্রু। কমলা পলায়নপর আনন্দের শেষ মধুবিন্দু নিংড়ে নিতে চায়। মৃত্যু ও কামনা যে পরস্পরের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ তা আজকের মতো আর কখনো সিদ্ধার্থের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কমলার গা ঘেঁষে চুপ করে শুয়ে আছে সে; ঠিক তার চোখের নিচেই কমলার মুখ। সেই মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে সিদ্ধার্থ আজ এই প্রথম লক্ষ করল বিষাদের চিহ্ন; দেখল কমলার চোখের নিচে ও ঠোঁটের কোণে সূক্ষ্ম রেখা, অগভীর ভাঁজ দেখা দিয়েছে; এরা জীবনের শীতের আগমন ঘোষণা করেছে, বার্ধক্য এল বলে। সিদ্ধার্থ সবে চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছে, কিন্তু এরই মধ্যে তার কালো চুলে দু-একটা শাদা চুল দেখা যায়। কমলার সুন্দর মুখের ওপর পড়েছে ক্লান্তির ছাপ; যে পথের শেষে আনন্দ-মধুর লক্ষ্য নেই, সেই দীর্ঘ নিরানন্দ পথে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে কমলা, বার্ধক্যের প্রথম পদক্ষেপ শ্রান্তির ছায়া ফেলেছে; আর সেই মুখে হয়তো ছায়া ফেলেছে একটি গোপন, অবচেতন ভয়, যে ভয়ের কথা কখনো মুখে উচ্চারণ করা হয়নি—জীবনে শীতঋতুর আবির্ভাবের ভয়, মৃত্যুর ভয়। সিদ্ধার্থ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কমলার কাছ থেকে বিদায় নিল। একটা অদৃশ্য ভয় ও বেদনায় তার হৃদয় ভরে উঠেছে।

বাড়ি ফিরে এসে সিদ্ধার্থ নর্তকী ও সুরা নিয়ে বসল। আসরে সবার উপরে তার স্থান, এমনি একটা ভান করে সিদ্ধার্থ। কিন্তু এখন তার শ্রেষ্ঠত্ব আর নেই। একটু একটু করে অনেক সুরা পান করেছে সে; মধ্যরাত্রি পার হবার পর এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল; দেহ শ্রান্ত, কিন্তু মনের উত্তেজনা এখনো শান্ত হয়নি। নিদারুণ হতাশায় চোখে প্রায় পানি আসার উপক্রম হয়েছে। নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে শুয়ে বৃথা নিদ্রার চেষ্টা করল। গভীর বেদনায় সিদ্ধার্থের হৃদয় পূর্ণ; এই বেদনার ভার সে আর বহন করতে পারছে না। প্রবল বিতৃষ্ণা তার দেহ-মন পীড়িত করছে; বিস্বাদ সুরা পান করল সে, দীর্ঘকাল হালকা মধুর সংগীত শুনল। নর্তকীর চটুল হাসি দেখে এবং তাদের কেশ ও বক্ষের তীব্র মধুর সুগন্ধির ঘ্রাণে যে বমনেচ্ছা জাগে, আজ সংসার-জীবন তেমনি বিবমিষায় পীড়িত করেছে সিদ্ধার্থকে। শুধু সংসারের ওপর নয়, অন্যের ওপর নয়, বিরক্তি এসেছে নিজের ওপরেও। তার চুলের সুগন্ধি, মুখের সুরার গন্ধ, নিজের ওপরে ঘৃণা জাগাচ্ছে। ক্রমশ শিথিল হয়ে আসা দেহের চামড়ার ওপর চোখ পড়লে ঘৃণায় শিউরে ওঠে সিদ্ধার্থ। মাত্রাহীন ভূরি-ভোজনের পর বমি করতে পারলে যেমন অস্বস্তি লাঘব হয়, তেমনি এই বিক্ষুব্ধ মানুষটি কামনা করছে যদি সে এই একান্ত অর্থহীন জীবনে আমোদ-প্রমোদ ও আচার-পদ্ধতি প্রচণ্ড শক্তিতে দূরে ছুড়ে ফেলতে পারত। ভোরে গৃহসংলগ্ন রাজপথে দিনের কর্মচাঞ্চল্য জেগে উঠলে সিদ্ধার্থের চোখে তন্দ্রা নেমে এল, কয়েকটি অর্ধচেতন মুহূর্ত নিয়ে এল নিদ্রার সুমধুর সম্ভাবনা। সেই সংকীর্ণ সময়ের নিদ্রায় সিদ্ধার্থ স্বপ্ন দেখল।

কমলার একটি ছোট দুষ্প্রাপ্য গীতমুখর পাখি ছিল। আদর করে তাকে সে রাখত

সোনার খাঁচায়। সিদ্ধার্থ এই পাখিটি সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখল। পাখিটি সকালে গান করত; একদিন গান শোনা গেল না, হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গেছে; সিদ্ধার্থ অবাক হয়ে খাঁচার কাছে গিয়ে লক্ষ্য করে দেখল, পাখিটি মরে শক্ত হয়ে খাঁচার মধ্যে পড়ে আছে। খাঁচা খুলে পাখিটিকে বের করে মুহূর্তকাল হাতের উপরে রাখল সে, তারপর ছুড়ে ফেলে দিল রাস্তায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে সিদ্ধার্থের বুক ব্যথায় মুচড়ে উঠল; ঐ মরা পাখিটার সাথে সে যেন ধূলায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে তার জীবনের যা-কিছু মহৎ ও মূল্যবান বস্তু।

স্বপ্ন ভাঙল, ঘুম থেকে জেগে উঠল সিদ্ধার্থ। একটা গভীর বেদনার অনুভূতি তার দেহ ও মনকে অবশ করে ফেলেছে। আজ মনে হল জীবনটা কাটিয়ে দিল অর্থহীন, মূল্যহীন কাজে। জীবন শেষ হয়ে এল, কিন্তু এমন কিছুই সে পেল না যা মূল্যবান, যা সঞ্চয় করে রাখবার যোগ্য। ডুবে-যাওয়া জাহাজের যাত্রীর মতো একাকী সে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে শুধু দাঁড়িয়ে রইল।

বিষণ্ন অন্তরে সিদ্ধার্থ তার প্রমোদ-উদ্যানে প্রবেশ করে গেট বন্ধ করে দিল। ধীরে ধীরে সে এসে বসল আমগাছের তলায়। তার হৃদয়ে ধ্বনিত হচ্ছে বিভীষিকার অনুভূতি ও মৃত্যুর ভয়। চুপ করে বসে বসে তার মনে হল সে মরে যাচ্ছে, ম্লান হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারপর ক্রমে ক্রমে অসংলগ্ন ভাবনাগুলো একত্র করে সমগ্র জীবনের ইতিহাস মনে মনে উলটেপালটে দেখল। সত্যিকার সুখী সে কি হয়েছে? প্রকৃত আনন্দ অনুভব করেছে কখনো জীবনে? আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ অবশ্য করেছে কয়েকবার। শৈশবে সহপাঠীদের অপেক্ষা অনেক বেশি শিখে, পবিত্র মন্ত্র সুষ্ঠুরূপে উচ্চারণ করে, পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কে পারদর্শিতা দেখিয়ে, যজ্ঞানুষ্ঠানে সাহায্য করে সিদ্ধার্থ যখন ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করেছে, তখন সে আনন্দ অনুভব করেছে। তখন অন্তরে যেন কার আহ্বান শুনেছে সে তখন : 'তোমার সামনে পথ পড়ে আছে, এসেছে সেই পথে এগিয়ে যাবার নির্দেশ; তুমি দেবতার আশীর্বাদ লাভ করবে।'

তারপর যৌবনে যখন ঊর্ধ্বগামী লক্ষ্যের প্রেরণা তাকে অন্যান্য তত্ত্বানুসন্ধানীর মাঝে বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে, যখন সে ব্রাহ্মণদের ধর্মোপদেশ বুঝার জন্য কঠোর সাধনা করেছে, যখন প্রত্যেক লব্ধ জ্ঞান নতুন তৃষ্ণা জাগিয়ে দিয়েছে; তখন সেই তৃষ্ণা ও সাধনার প্রচেষ্টার মধ্যে তার মনে হয়েছে : চলো, এগিয়ে চলো; এই তো তোমার পথ। গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের সময় সে এই বাণী শুনেছে; আবার শুনেছে শ্রমণদের ত্যাগ করে বুদ্ধের কাছে যাবার সময়; জেতাবন ত্যাগ করে অজ্ঞাত জীবনের পথে যাত্রা শুরু করার সময়ও শুনেছে অন্তরের এই বাণী। আজ কতদিন হয়ে গেল, এগিয়ে যাবার বাণী স্তব্ধ হয়ে গেছে; দৈনন্দিন জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে পবিত্র আনন্দলাভ করবার সুযোগ কতদিন হয়নি! তার জীবনের পথ কী নীরস ও মরুময়! কত দীর্ঘকাল সে কাটিয়েছে কোনো উচ্চাদর্শ ছাড়া; মহৎ উল্লাস কতদিন তার জীবনে আসেনি! তুচ্ছ সুখ নিয়ে সে ভুলে ছিল, অথচ কখনো সত্যিকার তৃপ্তি লাভ করেনি। এ-কথা বুঝতে না-পেরে দীর্ঘকাল সে আকাঙ্ক্ষা করেছে, চেষ্টা করেছে সংসারী লোকদের মতো হতে, শিশুদের মতো হতে, তবু সে হতে পারেনি তাদের একজন, বরং ওদের অনুকরণ করতে গিয়ে তার জীবন আরো দরিদ্র, আরো দুঃখময় হয়ে উঠেছে। কারণ তাদের আদর্শ সিদ্ধার্থের

নয়, তাদের দুঃখও সিদ্ধার্থের দুঃখ নয়। কামস্বামীর জগৎ ও সেখানকার অধিবাসীরা সিদ্ধার্থের চোখে একটি দর্শনযোগ্য নৃত্যনাট্য অথবা প্রহসন। একমাত্র প্রিয়জন কমলা; সিদ্ধার্থের জীবনে শুধু কমলারই মূল্য ছিল; কিন্তু এখনো কি সে মূল্য আছে? এখনো কি তার কমলাকে প্রয়োজন, কমলাও কি চায় তাকে? তারা দুজনেও কি এমন খেলা করছিল না—যে খেলার শেষ নেই? সেই খেলার জন্য কি বেঁচে থাকা প্রয়োজন? না। এই খেলার নাম সংসার—সন্তান লাভের খেলা; একবার, দুবার, হয়তো দশবার ভালো লাগে এই খেলা; কিন্তু বারবার খেলবার মতো প্রয়োজন আছে কি?

আজ এ মুহূর্তে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল খেলা শেষ হয়েছে, আর সে এই খেলা খেলতে পারবে না। সিদ্ধার্থের দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল, কী যেন মরে গেল তার মাঝে। সেই মৃত্যুর শেষ বিক্ষেপ সিদ্ধার্থকে নাড়া দিয়ে গেল।

সিদ্ধার্থ সারাদিন বসে থাকল আমগাছের তলায়। বসে বসে ভাবতে লাগল তার পিতার কথা, গোবিন্দের কথা, গৌতমের কথা। এদের ত্যাগ করে সে চলে এসেছে শুধুই কি আর-একজন কামস্বামী হবার জন্য? সন্ধ্যা হল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল, তবু সিদ্ধার্থ স্থির হয়ে বসে আছে। একবার মুখ তুলল, চোখে পড়ল আকাশের তারা। মনে মনে ভাবল : আমগাছের নিচে আমারই প্রমোদ-উদ্যানে বসে আছি! একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল তার মুখে। তার নিজের অধিকারে একটি আমগাছের বাগান রাখা কি নির্বোধের কাজ হয়নি? এর কী প্রয়োজন ছিল? এ কি উচিত হয়েছে?

সম্পত্তি কুড়ানোর প্রবৃত্তির মৃত্যু ঘটল। সিদ্ধার্থ উঠে বিদায় নিল আমগাছ ও প্রমোদ-উদ্যান থেকে। সারাদিন অনাহারে প্রচণ্ড ক্ষুধা জ্বলে উঠেছে ভেতরে; মনে পড়ে গেল তার কাছে বাড়ির কথা, তার শয্যা আর নানা সুস্বাদু খাবারের লোভনীয় ছবি। আবার একটু শ্রান্ত হাসি দেখা দিল তার মুখে, সব সে ত্যাগ করেছে; বিদায় নিল বাড়ি, শয্যা ও খাবারের কাছ থেকে!

সে রাতেই সিদ্ধার্থ উদ্যান ও নগর ত্যাগ করে চলে গেল; আর ফিরে এল না। কামস্বামী দীর্ঘকাল ধরে তার সন্ধান করেছে, তার ধারণা হয়েছিল সিদ্ধার্থ দস্যু ডাকাতের হাতে পড়েছে। কিন্তু কমলা তার মুখ থেকে শুনবার চেষ্টা করেনি। কমলা একটুও বিস্মিত হয়নি সিদ্ধার্থের অদৃশ্য হবার সংবাদ শুনে। সে কি এই সংবাদেরই অপেক্ষা করছিল এতদিন? সিদ্ধার্থ কি আসলে গৃহহীন, তীর্থযাত্রী, শ্রমণ নয়? শেষ সাক্ষাতের দিন কমলার এই কথাই বড়বেশি মনে পড়ছিল। শেষ মিলনমুহূর্তে সিদ্ধার্থকে সুদৃঢ় আলিঙ্গনে সে বুকের মধ্যে টেনে এনেছিল; সিদ্ধার্থও তাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও বিবশ করে ফেলেছিল সেদিন। আজ এই হারানোর বেদনার মধ্যেও মিলনের মধুর স্মৃতি আনন্দের রেশ বয়ে আনছে।

সিদ্ধার্থের নিখোঁজ হবার সংবাদ পেয়ে কমলা সর্বপ্রথম জানালার কাছে গেল, যেখানে সোনার খাঁচায় রেখেছিল একান্ত বিরল জাতের একটি গায়ক পাখি। খাঁচা খুলে পাখি ছেড়ে দিল সে। দূরের আকাশে বিলীয়মান পাখির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকল কমলা। সেদিন থেকেই কমলার বাড়ির দ্বার অভ্যাগতদের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেল ; আরো কিছুদিন পরে কমলা আবিষ্কার করল, শেষ মিলনের ফলে সিদ্ধার্থের সন্তান তার গর্ভে এসেছে।

নদীর তীরে

ঘুরতে ঘুরতে শহর থেকে বহুদূরে চলে এসেছে সিদ্ধার্থ; আবার বনে প্রবেশ করেছে; পথের অনিশ্চয়তা থাকলেও সংকল্প স্থির হয়ে গেছে—আর ফিরে যাবে না সে। যে জীবনে এতদিন সে ডুবেছিল তার আকর্ষণ শেষ হয়েছে; আকণ্ঠ ভোজনের পর যেমন খাদ্যলিপ্সা চলে যায়, খাদ্য দেখলে বমিভাব জাগে, সংসার-জীবন সম্বন্ধেও সিদ্ধার্থের এসেছে সেই বিতৃষ্ণা। সঙ্গীতমুখর বিহঙ্গের মৃত্যু হয়েছে; যে পাখির মৃত্যু সে স্বপ্নে দেখেছিল তার সেই হৃদয়ের বিহঙ্গের। সংসারে সে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। স্পঞ্জ যেমন পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত পানি টেনে নেয়, তেমনি সিদ্ধার্থ চারিদিক থেকে মৃত্যু ও ঘৃণা শুষে নিয়েছে নিজের মধ্যে। আজ তাই অবসাদ, বিষাদ ও মৃত্যুর ছায়ায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে সে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে; সুখ ও শান্তি দিতে পারে।

সিদ্ধার্থ একান্তভাবে কামনা করে বিস্মৃতির, কামনা করে বিশ্রামের, আকাঙ্ক্ষা করে মৃত্যুর। হায়, আকাশ থেকে তার মাথায় যদি বাজ ভেঙে পড়ত! ঝোপের আড়াল থেকে বাঘ কেন ঝাঁপিয়ে পড়ে না তার ওপর? যদি এমন কোনো সুরা, এমন কোনো বিষ থাকত যা বিস্মরণ এনে দিতে পারে, ভুলিয়ে দিতে পারে এই যন্ত্রণা, আর এনে দিতে পারে সেই ঘুম, যে ঘুমের পর জাগরণ নেই। এমন কোনো নোংরামি নেই যা দিয়ে সে নিজেকে কলুষিত করেনি, এমন পাপ নেই যা থেকে সে মুক্ত, তার অন্তরে এমন কোন কালিমা আছে যার জন্য সে নিজেই দায়ী নয়? এর পরেও কি বেঁচে থাকা সম্ভব? এখনো কি বারবার নিঃশ্বাস ত্যাগ ও প্রশ্বাস গ্রহণ, ক্ষুধাবোধ, খাওয়া, ঘুমানো এবং নারীসঙ্গ সম্ভব? তার জীবনে সংসারচক্রের বিবর্তন কি শেষ হয়ে যায়নি?

বনের মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে নদী, তার তীরে এসে দাঁড়ায় সিদ্ধার্থ। মনে পড়ল অনেকদিন আগে এক মাঝি তাকে নদী পার করে দিয়েছিল; তখন সে যুবক, গৌতমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের পথ খুঁজতে বেরিয়েছে। নদীর তীরে দাঁড়িয়ে মনে দ্বিধা দেখা দিল। ক্লান্তি ও ক্ষুধায় দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। আর পথ চলে কী হবে, কোথায় যাবে, কী উদ্দেশ্যে? জীবনের এই অসংলগ্ন স্বপ্নকে দূর করার গভীর যাতনাময় আকাঙ্ক্ষা, বাসি মদ বমি করে ফেলার প্রবল তাড়না, তিক্ত, ব্যথাক্লিষ্ট জীবনের চিরসমাপ্তির অভিপ্রায় ছাড়া আর কোনো লক্ষ্যই সিদ্ধার্থের নেই।

নদীর তীর ঘেঁষে একটা নারিকেল গাছ। সিদ্ধার্থ এ গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে নিচে নদীর সবুজ জলপ্রবাহের দিকে চেয়ে রইল। পানির স্বচ্ছন্দ গতি দেখতে দেখতে হঠাৎ সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ সবুজ জলে ডুবে যেতে। তার আত্মার ভয়ঙ্কর শূন্যতা যেন প্রতিবিম্বিত হচ্ছে পানির শীতল শূন্যতায়। হ্যাঁ, এবার সিদ্ধার্থ মৃত্যুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। নিজেকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, তার জীবনের এই ব্যর্থ কাঠামো ধ্বংস করে দূরে নিক্ষেপ করা, দেবতাদের বিদ্রূপের পাত্র হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। তার ঘৃণিত দেহকে ধ্বংস করবার জন্য সিদ্ধার্থ ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। নদীর বড় বড় মাছগুলো যদি তাকে খেয়ে ফেলত! সে কুকুরের মতো জীবন

যাপন করছে, সে বিকৃতমস্তিষ্ক, অপব্যবহার করে সে আত্মাকে প্রাণহীন জড় পদার্থে পরিণত করেছে; সুতরাং তার দূষিত ও গলিত দেহ খেয়ে ফেললে ক্ষতি কী? হায়, মাছ ও কুমির যদি তার দেহ নিঃশেষ করে ফেলত, যদি কোনো পিশাচ নখরাঘাতে এই দেহকে শতখণ্ড করতে পারত তাহলে বুঝি সিদ্ধার্থের জ্বালা একটু কমত, প্রতিশোধ নেওয়া হত নিজের ওপর।

সিদ্ধার্থের বিকৃত মুখভঙ্গিতে ফুটে উঠল জীবনের ওপর বিরক্তি, নিজের ওপরে ঘৃণা। নদীর পানিতে প্রতিবিম্ব পড়ল তার মুখের; প্রতিবিম্ব দেখে নতুন করে ঘৃণা জেগে উঠল, ছি ছি করে উঠল সিদ্ধার্থ, থুতু ছিটিয়ে দিল ছায়ার ওপর। এতক্ষণ দুহাত পিঠের দিকে নিয়ে গাছটা জড়িয়ে ধরেছিল; এখন হাত ছেড়ে দিল, এবার সরাসরি নদীতে পড়ে যেতে বাধা নেই, তারপর ডুবে যাবে। দুই চোখ বন্ধ করে সে নত হল—ঝুঁকে পড়ল মৃত্যুর দিকে।

হঠাৎ অন্তরের এক সুদূর কোণ থেকে, তার ক্লান্ত জীবনের স্তূপীকৃত জঞ্জালরাশির তল থেকে, একটি স্বর ধ্বনিত হয়ে উঠল। কান পেতে শুনল সিদ্ধার্থ। একটিমাত্র শব্দ, পদ্যাংশও বলা যেতে পারে; কিছু না-ভেবেই সিদ্ধার্থ অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল শব্দটি। ব্রাহ্মণদের সকল প্রাচীন প্রার্থনার মন্ত্র যে-শব্দ দিয়ে আরম্ভ ও শেষ হয়, এ সেই পবিত্র 'ওম্', যার অর্থ 'পূর্ণ ব্রহ্ম' অথবা 'পূর্ণতা'। ওম্ শব্দ কানে যেতেই সিদ্ধার্থের ঘুমন্ত আত্মা জেগে উঠল, বুঝতে পারল কী নির্বুদ্ধিতার কাজ সে করতে যাচ্ছিল।

সিদ্ধার্থ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে সে; এত অধঃপতন হয়েছে, মন এমন বিভ্রান্ত হয়েছে, এমন যুক্তিহীন হয়ে পড়েছে সে যে মৃত্যু কামনা করছে, আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। দেহ ধ্বংস করে শান্তি লাভ করার ছেলেমানুষি পেয়ে বসেছে তাকে। এত যন্ত্রণা, এত হতাশা, এমন মোহভঙ্গও সিদ্ধার্থকে তত বিচলিত করতে পারেনি, তার চেতনায় 'ওম্' ধ্বনিত হয়ে যতটা করেছে। মুহূর্তের মধ্যে সে উপলব্ধি করল তার পাপ, তার দৈন্য। মনে মনে 'ওম্' উচ্চারণ করল সিদ্ধার্থ; সাথে সাথে সে সচেতন হয়ে উঠল ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে, বুঝতে পারল জীবন অবিনাশী, প্রাণপ্রবাহ অশ্রান্ত ধারায় বয়ে চলেছে। বিস্মৃতির আবরণ দূর হয়ে গেল; মনে পড়ল যা ভুলে গিয়েছিল, যা-কিছু পবিত্র ও মহৎ—নতুন করে তাদের সাথে পরিচয় হল।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য; অন্ধকার আকাশে বিদ্যুৎশিখার মতো ক্ষণকালের জন্য সিদ্ধার্থের অন্তর আলোকিত হয়ে উঠল। তারপর আবার গভীর ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে সিদ্ধার্থ নারিকেল গাছের গোড়ায় শুয়ে পড়ল। অস্পষ্টভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে গাছের শিকড়ের উপর মাথা রেখে গভীর নিদ্রায় ঢলে পড়ল। প্রগাঢ়, স্বপ্নবিহীন ঘুম। দীর্ঘকাল এমন ঘুম তার হয়নি।

অনেকক্ষণ পরে ঘুম ভাঙলে তার মনে হল যেন এর মধ্যে দশ বছর কেটে গেছে। নদীর মৃদু কলকল ধ্বনি শুনতে পেল শুয়ে শুয়ে; কোথায় আছে, কেন এসেছে এখানে, বুঝতে পারল না। উপরদিকে চেয়ে দেখল। ফাঁকা দিয়ে আকাশ দেখতে পেয়ে প্রথম বিস্মিত হয়ে গেল সে। তারপর মনে পড়ল : কোথায় শুয়ে আছে, কী করে এসেছে

এখানে। সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হল এমনি করে বহুক্ষণ শুয়ে থাকবে। তখন মনে হল অতীত ইতিমধ্যেই অবগুণ্ঠন টেনে দিয়েছে, বহুদূরে চলে গেছে, তা একান্ত মূল্যহীন এখন। জাগরণের প্রথম মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল অতীত জীবনটা যেন বহুদিন পূর্বেকার কোনো বিশেষ একটা মূর্তিমান রূপ; বর্তমানে যে আত্মা তার মধ্যে বাস করছে সেই আত্মাই হয়তো পূর্বজন্মে অন্য কোনো আকাশে মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সিদ্ধার্থ বেশ স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছে তার অতীত জীবনের সমাপ্তি ঘটেছে; জীবনের অতীত বিরক্তি এবং অসহ্য যাতনা তাকে প্ররোচিত করেছিল আত্মহত্যা করতে। কিন্তু পবিত্র 'ওম্' উচ্চারণ করে এই নদীর তীরে, নারিকেল গাছের ছায়ায়, সে আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। 'ওম্' উচ্চারণ করতে করতে সিদ্ধার্থ ঘুমিয়ে পড়েছিল, জেগে উঠেছে এক নতুন জগতে। যে 'ওম্'-মন্ত্র মুখে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর একবার মৃদুস্বরে তা উচ্চারণ করল; এ 'ওম্' তো ঘুম নয়, যেন সুদীর্ঘ সুগভীর 'এক-ধ্বনি, 'ওম্'-এর ধ্যান, 'ওম্'-এর মধ্যে প্রবেশ করা, ডুবে যাওয়া; নামহীন, রূপহীন ব্রহ্মের নৈকট্য লাভ করা।

কী চমৎকার ঘুম! আর কখনো ঘুম এমন সতেজ, নবীন ও নতুন করে তুলতে পারেনি সিদ্ধার্থকে। হয়তো সে নদীর পানিতে ডুবে গিয়েছিল, হয়তো সত্যি তার মৃত্যু হয়েছিল, আবার নবজন্ম হয়েছে নতুনরূপে। আসলে তা নয়; এখন সে চিনতে পেরেছে নিজের হাত-পাকে; যেখানে শুয়েছিল চিনেছে সে জায়গা; অন্তরবাসী আত্মাকে এবং স্বেচ্ছাচারী, ব্যক্তিতন্ত্রবাদী সিদ্ধার্থকেও চিনতে পেরেছে নতুন করে। তবু ঠিক সে সিদ্ধার্থ নয়, কোথায় যেন পরিবর্তন হয়েছে, নতুন রূপ পেয়েছে। আশ্চর্য ঘুম! তেমনি বিস্ময়কর, পরিপূর্ণ জাগরণ নিয়ে এসেছে তার মনে আনন্দ ও জিজ্ঞাসা।

সিদ্ধার্থ উঠে বসতেই দেখল তার সামনে মুণ্ডিত বেশ, পীতবসন পরিহিত এক ভিক্ষু ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে। সিদ্ধার্থ ভালো করে চেয়ে দেখল, অনেক পরিবর্তন হয়েছে--মাথায় চুল নেই, দাড়িগোঁফ কামানো; তবু বেশি দেরি হল না, চিনতে পারল গোবিন্দকে। যৌবনে বন্ধু তার সঙ্গ ত্যাগ করে বুদ্ধের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। গোবিন্দের বয়স হয়েছে, তবু তার মুখে এখনো পাঠ করা যায় স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যগুলো--ঔৎসুক্য, অনুগত জিজ্ঞাসা ও উৎকণ্ঠা। কিন্তু গোবিন্দ যখন তার দৃষ্টি অনুভব করে চোখ তুলে তাকাল তখন সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল সে তাকে চিনতে পারেনি। সিদ্ধার্থের ঘুম ভেঙেছে দেখে গোবিন্দ খুশি হল। মনে হল সে যেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে সিদ্ধার্থের ঘুম ভাঙার জন্য।

সিদ্ধার্থ বলল, 'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুমি এখানে কী করে এলে?'

গোবিন্দ উত্তর দিল, 'বন থেকে বেরিয়ে সাপ এবং হিংস্র পশু এখানে ঘুরে বেড়ায়; এমন স্থানে ঘুমানো উচিত হয়নি। আমি গৌতমের অগণিত শিষ্যদের একজন। কয়েকজন ভিক্ষুর সাথে বেরিয়েছি তীর্থভ্রমণে। এমন বিপদসংকুল স্থানে আপনাকে ঘুমাতে দেখে প্রথম জাগাতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু দেখলাম নিদ্রা অত্যন্ত গভীর, তাই দলত্যাগ করে আপনার কাছে বসলাম। কিন্তু দেখছি, আপনাকে পাহারা দেবার জন্য বসে আমি নিজেও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ক্লান্তি আমাকে পরাস্ত করেছিল, তাই কর্তব্য

পালনে ত্রুটি হয়েছে। যাক এখন তো আপনার ঘুম ভেঙেছে; এবার আমি যাই, সঙ্গীদের গিয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে হবে।'

'হে শ্রমণ, ঘুমের সময় পাহারা দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। গৌতমের শিষ্যদের হৃদয় করুণায় পূর্ণ। এবার তুমি তোমার কাজে যেতে পার।'

'আমি যাচ্ছি; আপনার মঙ্গল হোক।'

'শ্রমণ, তোমাকে ধন্যবাদ।'

গোবিন্দ নমস্কার করে বলল, 'বিদায়।'

সিদ্ধার্থ বলল, 'বিদায়, গোবিন্দ, বিদায়।'

ভিক্ষু থমকে দাঁড়ল। 'মহাশয়, ক্ষমা করবেন; আমার নাম আপনি জানলেন কী করে?'

সিদ্ধার্থ হেসে উঠল। 'গোবিন্দ, পিতার গৃহে, বিদ্যালয়ে, যজ্ঞানুষ্ঠানে, সন্ন্যাসীদের সঙ্গী হিসাবে ও জেতাবনে তোমার পরিচয় পেয়েছি।'

'তুমি সিদ্ধার্থ।'—প্রায় চিৎকার করে উঠল গোবিন্দ। 'এখন চিনতে পারছি; দেখামাত্রই চিনতে পারিনি কেন তা বুঝতে পারছি না। আমার অভিবাদন গ্রহণ করো সিদ্ধার্থ। তোমার সাথে আবার দেখা হওয়ায় অত্যন্ত সুখী হয়েছি।'

'এতদিন পরে তোমাকে দেখে আমিও সুখী হয়েছি। আমি ঘুমিয়েছিলাম, তুমি বসে বসে পাহারা দিয়েছ, যদিও তার দরকার ছিল না, তবু আবার তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছ বন্ধু?'

'যাবার কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সবসময় আমরা সর্বদা পথে পথে কাটাই : সর্বদাই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াই, সংঘের নিয়ম মেনে চলি; গৌতমের ধর্মোপদেশ প্রচার করি, ভিক্ষা সংগ্রহ করে নতুন কোনো জায়গার উদ্দেশে পথে বেরিয়ে পড়ি। এ একই নিয়মে চলছে আমাদের জীবন। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তুমি কোথায় চলেছ?'

সিদ্ধার্থ বলল, 'আমার অবস্থাও তোমার মতোই। কোথায় চলেছি তা আমারও জানা নেই। পথে পথে ঘুরছি। বেরিয়েছি তীর্থভ্রমণে।'

গোবিন্দ বলল, 'তুমি তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছ এ-কথা মেনে নিলাম। কিন্তু সিদ্ধার্থ, তোমাকে তো তীর্থযাত্রীর মতো দেখায় না। তোমার বেশ, পোশাক, জুতা, সুবাসিত কেশ ঐশ্বর্যের সাক্ষ্য দেয়; সন্ন্যাসের নয়।'

'বন্ধু, তুমি ভালো করেই লক্ষ করেছ। তোমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি থেকে কিছুই এড়িয়ে যায় না। কিন্তু আমি তো বলিনি যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি। বলেছি আমি তীর্থযাত্রী, এবং এ-কথা সত্য।'

গোবিন্দ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছ, কিন্তু তীর্থযাত্রীর এমন বেশ, এমন জুতা, এমন সুগন্ধি বেশ তো দেখা যায় না। কত বছর যাবৎ তো পথে পথে ঘুরছি, এমন তীর্থযাত্রী দেখতে পাইনি।'

'গোবিন্দ, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আজ তুমি এক অভিনব তীর্থযাত্রীর দেখা পেয়েছ। প্রিয় গোবিন্দ, মনে রেখো এই দৃশ্যজগৎ অনিত্য বেশভূষা

ও কেশবিন্যাসের রীতি। তুমি যথার্থ বলেছ। আমার বেশভূষা সত্যি ধনীলোকের। আমার মূল্যবান বস্ত্র ও জুতা দেখছ, তার কারণ আমি সংসারী ছিলাম।'

'সিদ্ধার্থ, এখন তুমি কী?'

'তা জানি না, তুমি যতটুকু জানো তার বেশি আমারও জানা নেই। শুধু জানি আমি পথিক, পথে বেরিয়েছি। একদিন ঐশ্বর্য ছিল, আজ নেই; কাল আমার কী হবে, তা-ও বলতে পারি না।'

'ঐশ্বর্য হারিয়েছ?'

'আমি ঐশ্বর্য হারিয়েছি, অথবা ঐশ্বর্যই আমাকে হারিয়েছে—তা ঠিক জানি না। গোবিন্দ, বাহ্যরূপের চাকা দ্রুত আবর্তিত হয়। সেই ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থ, সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ, ধনী সিদ্ধার্থ আজ কোথায়? যা অনিত্য তার বড় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, গোবিন্দ। এ-কথা তো তুমি জানো।'

আশৈশব বন্ধু সিদ্ধার্থের মুখের দিকে বহুক্ষণ সংশয়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে গোবিন্দ। তারপর সিদ্ধার্থকে অভিবাদন করে গোবিন্দ নিজের পথ ধরল।

হাসিমুখে সিদ্ধার্থ তার পথের দিকে চেয়ে রইল। এখনো সে ভালোবাসে গোবিন্দকে—তার বিশ্বস্ত বন্ধুত্বকে। সিদ্ধার্থের সত্তায় 'ওম্' অনুপ্রবেশ করে অপূর্ব ঘুম এনে দিয়েছিল; সেই ঘুম ভেঙে নবজীবন লাভের আশ্চর্য মুহূর্তে কোনো লোক বা কোনো জিনিসকে ভালো না বেসে পারবে কী করে? সেই অদ্ভুত নিদ্রা ও ওম্ মন্ত্রের প্রভাব তাকে জাদু করেছে; এখন সে সবকিছু ভালোবাসে; চারিদিকে যা-কিছুর ওপর চোখ পড়ে তার প্রতি আনন্দোৎফুল্ল প্রেম উথলে ওঠে। আগে কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে এমন করে ভালোবাসতে পারেনি; হয়তো সেজন্যই তার জীবন দুঃখময় ছিল।

ক্রমশ দূরগামী ভিক্ষুর পথের দিকে হাসিমুখে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থ। নিদ্রা তাকে সতেজ করেছে, কিন্তু দুদিন অনাহারে থাকবার ফলে প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে। ক্ষুধার জ্বালা অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা কবে হারিয়ে গেছে। যন্ত্রণার মধ্যেও সে হেসে উঠল, মনে পড়ল সেদিনের কথা। মনে পড়ল, কমলার কাছে তিনটি জিনিসের জন্য গর্ব করেছিল, তিনটি মহৎ ও অপরাজেয় গুণ : উপবাস, প্রতীক্ষা ও ধ্যান। তখন এই তিনটি ছিল তার একমাত্র সম্পদ, তার শক্তি ও ক্ষমতা, তার সুদৃঢ় অবলম্বন। সিদ্ধার্থ যৌবনে কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা এই তিনটি গুণই আয়ত্ত করতে পেরেছিল, আর কিছু শেখেনি। এখন সিদ্ধার্থ তাদের হারিয়েছে; উপবাস, প্রতীক্ষা ও গভীর চিন্তা করবার ক্ষমতা-- এদের একটি গুণও তার নেই। এদের সে বিনিময় করেছে অতি তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী জিনিসের জন্য; বিনিময় করেছে ইন্দ্রিয়-সুখের লালসায়, অর্থ ও ভোগবিলাসের মোহে। সিদ্ধার্থ অপরিচিত পথে ভ্রমণে বেরিয়েছিল; ভ্রমণ শেষ হবার পর দেখছে সে আর পাঁচজন মানুষের মতো সাধারণ হয়ে পড়েছে।

সিদ্ধার্থ নিজের অবস্থা চিন্তা করতে লাগল। চিন্তা করাটা কঠিন হয়ে উঠেছে তার পক্ষে, ভাবতেই ইচ্ছা করে না, তবু জোর করে ভাবছে।

তার মনে হল : যা ক্ষণস্থায়ী তা ঝরে পড়েছে আমার জীবন থেকে; আবার আমি এসে দাঁড়িয়েছি মুক্ত আকাশের নিচে—যেমন করে দাঁড়াতাম শিশুকালে। কিছুই আমার

নয়, আমি কিছু জানি না, আমার কিছু নেই, আমি কিছুই শিখিনি। কী অদ্ভুত মনে হয়! যখন যৌবন অতিক্রান্ত, যখন আমার চুলগুলি দ্রুত শাদা হয়ে উঠছে, যখন দেহের শক্তি হ্রাস পাচ্ছে তখন নিজেকে শিশুর মতো নতুন মনে হচ্ছে।

আবার সিদ্ধার্থের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সত্যি, কী অদ্ভুত তার অদৃষ্ট! সে সন্ন্যাস ত্যাগ করে পশ্চাতে চলছিল; কিন্তু আবার ফিরে এসেছে শূন্য হাতে—নগ্ন ও সংসার-অনভিজ্ঞ হয়ে। কিন্তু তার জন্য কোনো ক্ষোভ নেই; বরং একটা প্রবল ইচ্ছা হয় হেসে উঠবার; নিজের দুর্দশায় হাসতে ইচ্ছা হয়, এই নির্বোধ এবং আশ্চর্য পৃথিবীর মুখের ওপর বিদ্রূপের হাসি ছুড়ে মারতে ইচ্ছা হয়। সিদ্ধার্থ মনে মনে হেসে বলল : তোমার সবকিছু পশ্চাদগামী হয়েছে।

এই কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ল নদীর স্রোতের ওপর; দেখল নদী কুলুকুলু ধ্বনি করতে করতে পিছুটানে অবিশ্রাম বয়ে চলেছে। দেখে অত্যন্ত খুশি হল; সানন্দ হাসি দিয়ে সম্ভাষণ জানাল নদীকে। এই নদীতেই সে ডুবে মরতে চেয়েছিল? সে যেন শত শত বছর আগের কথা; অথবা শুধুই স্বপ্ন?

সিদ্ধার্থ ভাবছে, কী আশ্চর্য তার জীবন! কত নতুন, অজানা পথে ঘুরছে সে। 'কিশোর বয়সে আমি দেবতার অর্চনা ও যাগযজ্ঞ নিয়ে মগ্ন ছিলাম; যৌবন কেটে গেছে ধ্যান ও তপস্যায়। ব্রহ্মকে খুঁজে ফিরেছি। আত্মার মধ্যে শাশ্বতের প্রকাশকে পূজা করেছি। যৌবনে প্রায়শ্চিত্ত ও কঠোর জীবনযাপন আমাকে আকৃষ্ট করেছে। গ্রীষ্মে ও শীতে বনে বনে ঘুরেছি। শিখেছি উপবাস করতে, জেনেছি দেহকে জয় করবার কৌশল। তারপর একদিন আবিষ্কার করলাম বুদ্ধের বাণী, মুগ্ধ হলাম। সেই বাণী থেকে শিখেছি সংসার সম্বন্ধে, অনেক জ্ঞানে জেনেছি যে পৃথিবীর বৈচিত্র্যের অন্তরালে আছে গভীর ঐক্য; এই অনুভূতি তখন রক্তের মতো আমার সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হত। কিন্তু তবু আমি বাধ্য হয়েছিলাম বুদ্ধ এবং তার মহান উপদেশ ত্যাগ করতে। তারপর নগরে গিয়ে কমলার কাছে শিখলাম প্রেমের কলা আর কামস্বামীর কাছে ব্যবসা। কত অর্থ সঞ্চয় করলাম, দুহাতে টাকা উড়িয়ে দিলাম; অভ্যাস হল উপাদেয় খাদ্য খাবার, ইন্দ্রিয় উত্তেজিত করবার কৌশলও শিখে নিলাম। অনেক বছর এমনি করে কাটবার ফলে বুদ্ধি হারিয়ে গেল, চিন্তার শক্তি আর রইল না, ভুলে গেলাম বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যবোধকে। এ কি সত্য নয় যে ধীরে ধীরে অনেক ভ্রান্তপথ ঘুরে ঘুরে আমি আবার শিশু হয়েছি, পরিণত বার্ধক্য থেকে শৈশবে ফিরে এসেছি? যে পারত ধ্যান করতে, সে কি নেমে আসেনি সংসারের সাধারণ মানুষের মধ্যে? এ পথে ভালোই কেটেছে এবং দেখা গেল অন্তরবাসী সোনার পাখিটি এখনো মরেনি; কিন্তু কী পথই-না গেছে! নতুন জীবন লাভ করার জন্য কত নির্বুদ্ধিতা, পাপ, ভুল, বিরক্তি, দুঃখ ও মোহ ভঙ্গের মধ্যদিয়ে আসতে হয়েছে!

হয়তো এটাই ঠিক, এমনি করেই হওয়া উচিত। আমার চোখ ও হৃদয় নবজীবনকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কত হতাশার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, কতবার অন্তরের গভীর তলদেশে ডুবে গেছি; অনুকম্পা লাভের জন্য আত্মহত্যার কথা

ভেবেছি; আবার 'ওম্'-ধ্বনি শুনতে চেয়েছি এবং আকাঙ্ক্ষা করেছি : আর একবার যেন তেমনি গভীর ঘুম নেমে আসে, তা হলে জেগে উঠতে পারব সতেজ নবীনতায়। নিজের মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করার জন্য আর একবার নির্বোধ হতে হয়েছে; নতুন করে বাঁচার জন্য পাপকার্যে লিপ্ত হতে হয়েছে। এখন আবার পথ আমাকে নিয়ে যাবে কোন্ দিকে? এ পথ চলেছে নির্বোধের মতো, সোজা চলে না, এগিয়ে যাচ্ছে বৃত্তাকারে, পেঁচানো পথ ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছে। যেদিকেই যাক, এ পথ ধরেই এগিয়ে যাব।

সিদ্ধার্থ অনুভব করল তার অন্তরে গভীর আনন্দের জোয়ার জেগে উঠেছে।

কোথা থেকে এল এই আনন্দ? এই সুখানুভূতির কারণ কী? এ কি দীর্ঘ সুনিদ্রার ফল? অথবা 'ওম্'-মন্ত্রের প্রভাবে আমার অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল? কিংবা অতীতের বিষাক্ত জীবন থেকে এতদিন পরে মুক্ত হতে পেরেছি বলে, পালিয়ে এসে শিশুর মতো খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে পেরেছি বলে এই আনন্দ? আহা কী আনন্দ তার তৃপ্তিতে ভরা, এই পলায়ন, এই মুক্তি—সুগন্ধি দ্রব্য, মশলা, বাহুল্য ও জড়ত্বের আবহাওয়া থেকে এই মুক্তি। ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করতাম, তাই দুহাতে টাকা উড়িয়ে দিয়েছি পানোৎসবে ও জুয়াখেলায়। সেই ভয়ঙ্কর আবহাওয়ায় এত দীর্ঘকাল পড়ে থাকার জন্য নিজেকে ঘৃণা করেছি! নিজেকেই কত ঘৃণা করেছি, ব্যর্থ করেছি, বিষাক্ত ও ক্লিষ্ট করেছি; আর তার ফলে দিনে দিনে বৃদ্ধ ও কুশ্রী হয়ে উঠেছি। একদিন নির্বোধের মতো ভেবেছিলাম সিদ্ধার্থ খুব বুদ্ধিমান! সে ভুল আর করব না। কিন্তু একটা ভালো কাজ করেছি, তার জন্য আনন্দ পাই এবং নিজেকে প্রশংসাও করি· সেই অর্থহীন শূন্য জীবন এবং আত্মাবমাননা অন্তত শেষ করে দিয়েছি। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি, সিদ্ধার্থ; তুমি যে এতদিনে পঙ্কিল জীবন থেকে মুক্ত হয়ে এক মহৎ আদর্শ অনুসরণ করে এগিয়ে আসতে পেরেছ তা অভিনন্দনযোগ্য, বিরাট এক কাজ করেছ তুমি। সবচেয়ে বড় কথা তোমার অন্তর-বিহঙ্গ আবার গান গেয়ে উঠেছে, আর সে গান তুমি শুনতে পেয়েছ, সে গান অনুসরণ করে চলেছ নতুন জীবনের পথে।

সিদ্ধার্থ নিজেই নিজের প্রশংসা করল, মন ভরে উঠল আনন্দে এবং কান পেতে কৌতুকের সঙ্গে শুনতে লাগল ক্ষুধার্ত শূন্য পেটের গড়গড় শব্দ। সে এখন উপলব্ধি করেছে অতীত জীবনে যত দুঃখ ও যন্ত্রণা ভোগ করেছে, যার আবর্তে পড়ে সে হতাশা ও মৃত্যুর মধ্যে ডুবতে বসেছিল, সেই দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে অনেকটা মুক্তি লাভ করেছে। কিংবা হয়তো পেয়েছে সম্পূর্ণ মুক্তি। সিদ্ধার্থ আরো অনেকদিন কামস্বামীর সঙ্গে থাকতে পারত, অর্থ উপার্জন করে দুহাতে উড়িয়ে দিতে পারত; দেহের খাদ্য যোগান দিয়ে আত্মাকে উপবাসী রাখতে পারত; হতাশার সেই চরম মুহূর্তটি যদি না আসত, নদীর জলে ডুবে মরতে উদ্যত হবার উত্তেজনাপূর্ণ অভিজ্ঞতা যদি লাভ না করত, তাহলে কে জানে, আরো কতকাল সেই নরম গদির নরকে ঘুমিয়ে কাটাতে হত! এই হতাশা ও চরম বিতৃষ্ণার অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে এসেও পরাজিত হয়নি সিদ্ধার্থ। অন্তর-বিহঙ্গ, আত্মার স্বচ্ছ

উৎস এবং অন্তরবাসী স্বর এত আঘাত ও অবহেলা সত্ত্বেও বেঁচে আছে; তাই সে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, বিষণ্ণতা দূর হয়ে হাসি ফুটেছে, এবং শাদা চুলের নিচে প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে তার মুখ।

সিদ্ধার্থ ভাবল : ব্যক্তিগতভাবে জীবনের সব অভিজ্ঞতা লাভ করাই ভালো। শিশুকাল থেকে শুনে এসেছি পার্থিব সুখ এবং ঐশ্বর্য মঙ্গলকর নয়। দীর্ঘকাল এই উপদেশ জ্ঞানের ঘরে সঞ্চিত ছিল; কিন্তু এখন অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে তার সত্যতা উপলব্ধি করছি। এখন শুধু বুদ্ধি দিয়ে নয়, বুঝতে পেরেছি চোখ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, জঠরের জ্বালা দিয়ে। এমনি করে জানতে পেরে আমার মঙ্গলই হয়েছে।

অনেকক্ষণ ধরে সে ভাবল তার রূপান্তরের কথা; কান পেতে শুনল তার অন্তর-বিহঙ্গের আনন্দমুখর সঙ্গীত। অন্তরের এই বিহঙ্গ যদি মরে যেত, তাহলে সিদ্ধার্থেরও কি মৃত্যু হত না? না, তার মধ্যে অন্যকিছু মরেছে, যার মৃত্যু দীর্ঘকাল সে কামনা করে এসেছে। তার উগ্র সন্ন্যাসব্রত পালনের সময় তো এরই ধ্বংস সে চেয়েছে। সে কি তার ব্যক্তিসত্তা নয়? সেই ক্ষুদ্র জিনিশটি তার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, বারবার পরাজিত হয়েছে, তার সুখ ও শান্তি হরণ করে নিয়ে তাকে ভীত করে তুলেছে। আজ এই বনে সুন্দর নদীর তীরে, সেই ব্যক্তিসত্তারই কি মৃত্যু হল না? এর মৃত্যু হয়েছে বলেই তো সিদ্ধার্থ আজ শিশুর মতো নবজীবনের সুখে চঞ্চল, ভয়হীন; আশায় ও আনন্দে পূর্ণ।

সিদ্ধার্থ যখন ব্রাহ্মণ ছিল, যখন তপস্বী ছিল, তখন ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হতে পারেনি কেন তা-ও আজ সে উপলব্ধি করতে পারল। তার পুঁথিগত বিদ্যার আধিক্য এর অন্তরায় ছিল; মন্ত্র ও যাগযজ্ঞের বাহুল্য, দেহের অতিরিক্ত পীড়ন এবং মাত্রাহীন কঠোর পরিশ্রম উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। সে ছিল দাম্ভিক, সকলের চেয়ে চতুর, সকল ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যগ্র, সর্বদাই অন্যের অপেক্ষা এক পা এগিয়ে; সর্বদাই সে ছিল পুরোহিত অথবা ঋষি। তার অহং আশ্রয় নিয়েছিল এই দম্ভে, পৌরোহিত্য এবং বুদ্ধির অহংকারের মধ্যে। সিদ্ধার্থ যখন উপবাস ও প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অহংকে ধ্বংস করেছে বলে ভাবছে, তখন অহং তার দম্ভ ও বুদ্ধিমত্তা আশ্রয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এখন সিদ্ধার্থ তার ভুল বুঝতে পেরেছে, বুঝতে পেরেছে তার অন্তরের নির্দেশই সত্য : কোনো গুরুই তাকে মুক্তি এনে দিতে পারত না। তাই তাকে যেতে হয়েছিল সংসারজীবনের মধ্যে; ক্ষমতা, নারী ও অর্থ নিয়ে ভুলে ছিল। তার মধ্যকার পুরোহিত ও সন্ন্যাসীর সত্তা যতদিন না নিঃশেষে মরে গিয়েছিল, ততদিন সেই কারণেই সিদ্ধার্থকে ব্যবসা, পাশাখেলা, সুরা ও ঐশ্বর্য নিয়ে ভুলে থাকতে হয়েছে। সেই ভয়ঙ্কর বছরগুলোর মধ্যদিয়ে সেজন্যই তাকে যেতে হয়েছে; ভোগ করতে হয়েছে বিবমিষার যাতনা; ব্যর্থ ও শূন্য জীবনের উন্মাদনা থেকে শিক্ষা পেয়েছে, তিক্ত হতাশার পাত্র নিঃশেষে পান করতে হয়েছে; আমোদপ্রিয় সিদ্ধার্থ ও ধনী সিদ্ধার্থের মৃত্যুর জন্যই এই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল। তার মৃত্যু হয়েছে, নিদ্রার পরে জেগে উঠেছে আর এক নতুন সিদ্ধার্থ। অনিত্য—সকল বাহ্যিক আকৃতিই অনিত্য। কিন্তু আজ সে নবীন, এই নতুন সিদ্ধার্থ আজ শিশু, অত্যন্ত সুখী।

সিদ্ধার্থ বসে বসে এসব কথা ভাবছে। মৌমাছির গুঞ্জনের মতো পেটে শব্দ হচ্ছে—সিদ্ধার্থের মুখে হাসি ফুটে উঠল ক্ষুধার আহ্বান শুনে। সানন্দে সে নদীর প্রবহমান জলধারা দেখতে লাগল। আর কোনো নদী এর আগে তাকে এমন করে আকৃষ্ট করেনি। পানির বয়ে চলার দৃশ্য এবং কুলুকুলু ধ্বনি যে এত সুন্দর তা সিদ্ধার্থের জানা ছিল না। তার মনে হল নদীর যেন তার জন্য বিশেষ কোনো বাণী আছে, যা সে জানে না, যা তাকে নতুন করে শিখতে হবে। এই নদীর পানিতে সিদ্ধার্থ ডুবে মরতে চেয়েছিল; বৃদ্ধ, শ্রান্ত, হতাশাক্লিষ্ট সিদ্ধার্থ আজ সত্যি ডুবে মরেছে এই নদীতে। এই জলপ্রবাহ তাকে গভীর প্রেমে বন্দি করেছে। মনে মনে সে স্থির করল শিগগির সে এই নদী ছেড়ে কোথাও যাবে না।

মাঝি

সিদ্ধার্থ ভাবল, এই নদীর তীরেই থাকব আমি। শহরে যাবার পথে এই নদী পার হয়েছিলাম। একজন হিতৈষী মাঝি নদী পার করে দিয়েছিল। আমি আবার তার কাছে যাব। একদিন তার কুটির থেকেই নতুন জীবনের পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম; সে জীবন জীর্ণ হয়ে ঝরে পড়েছে। আমার বর্তমান পথ—আর একটি নতুন জীবন, আরম্ভ হোক সে কুটির থেকে।

নদীর স্বচ্ছ সবুজ প্রবহমান জলধারার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল সিদ্ধার্থ। স্ফটিকের রেখা দিয়ে তৈরি কত অপূর্ব নকশা ভেসে চলেছে নদীর বুকের উপর দিয়ে! সিদ্ধার্থ দেখছে কত উজ্জ্বল মুক্তা নদীর তলদেশ থেকে উপরে ভেসে উঠছে, কাচের মতো নদীর উপর দিয়ে বুদবুদে ভেসে চলেছে, সেই বুদবুদে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আকাশের নীলিমা। সবুজ, শাদা, স্ফটিকস্বচ্ছ এবং আসমানি রঙের সহস্র চক্ষু মেলে নদী সিদ্ধার্থকে দেখছে। সে কত ভালোবাসে এই নদীকে, কেমন করে মুগ্ধ করেছে তাকে এই নদী, কত কৃতজ্ঞ সে এই নদীর কাছে। তার নবজাগ্রত যৌবন-বিহঙ্গের সুর শুনতে পেল : 'এই নদীকে ভালোবাসো, এর কাছে থাকো, নদীর কাছে শিক্ষালাভ করো।' হ্যাঁ, নদীর কাছ থেকে সে শিখতে চায়, শুনতে চায় নদীর কথা। সিদ্ধার্থের মনে হল : যে নদীকে বুঝবে, তার রহস্যের কথা জানবে, সে বৃহত্তর উপলব্ধির ক্ষমতা লাভ করবে, জানতে পারবে অনেক গোপন রহস্য—হয়তো-বা সকল রহস্য।

আজ সিদ্ধার্থ নদীর একটি রহস্য শুধু দেখেছে, এবং সেই জ্ঞান তার অন্তরকে আকৃষ্ট করেছে। সিদ্ধার্থ দেখছে পানি নিরবচ্ছিন্ন ধারায় কেবল বয়েই চলেছে, তবু পানি সর্বদাই বিদ্যমান, নদীর কোনো অংশই পানিশূন্য হয়ে পড়ে না, সর্বদা পানি রয়েছে, তবু প্রতিমুহূর্তে সে পানি নতুন; চিরপ্রবহমান, চিরনতুন, চিরপূর্ণ এই নদী। কে ধারণা করবে, বুঝতে পারবে এই সত্য? সিদ্ধার্থ এই রহস্য উপলব্ধি করতে পারেনি। তার জীবনের চিরপ্রবহমানতা রুদ্ধ হয়ে গেছে। অতীত ও বর্তমান জীবনের অখণ্ডতা নেই। অতীতের আছে শুধু অস্পষ্ট সন্দেহ, ঝাপসা স্মৃতি এবং দৈববাণীর রেশ।

সিদ্ধার্থ উঠে দাঁড়াল, ক্ষুধার তাড়না অসহ্য হয়ে উঠেছে। নদীর কলধ্বনি এবং পেটে ক্ষুধার আর্তনাদ শুনতে শুনতে অতিকষ্টে সে নদীতীর ধরে হাঁটতে লাগল।

খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখল নৌকা বাঁধা আছে; যে মাঝি একদিন তরুণ সন্ন্যাসীকে পার করে দিয়েছিল সে নৌকায় বসে আছে! অনেক বয়স হয়েছে মাঝির, তবু সিদ্ধার্থ তাকে চিনতে পারল।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে পার করে দেবে?'

একজন ভদ্রলোক একাকী পায়ে হেঁটে এসেছে দেখে মাঝি বিস্মিত হল; আগন্তুককে তুলে নিয়ে নৌকা ছেড়ে দিল।

'চমৎকার জীবন বেছে নিয়েছ তুমি', বলল সিদ্ধার্থ। 'নদীর কাছে বাস করা, নদীর বুকে নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়ানোর মতো আনন্দ আর কী আছে?'

বৈঠার টানে একপাশে একটু কাত হয়ে মাঝি হাসল।

'সত্যি আমার জীবন সুন্দর। কিন্তু সব জীবন, সব কাজই কি সুন্দর নয়?'

'হয়তো সুন্দর, কিন্তু তোমার জীবনকে আমি হিংসা করি।'

'কিন্তু হায়, এ জীবন দুদিনেই আপনার কাছে বিষময় হয়ে যাবে। এ জীবন ধনীর জন্য নয়।'

সিদ্ধার্থ হেসে বলল, 'আজ সবাই আমাকে পোশাক দিয়ে বিচার করছে, পোশাকের জন্য সন্দেহের চোখে দেখছে। এই পোশাকের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠেছি; তুমি গ্রহণ করবে এগুলো? তা ছাড়া ভাড়া দেবার পয়সাও আমার নেই।'

মাঝি হেসে বলল, 'আপনি ইয়ার্কি করছেন।'

'না বন্ধু, আমি তামাশা করছি না। আগেও তুমি একবার বিনা পয়সায় নদী পার করে দিয়েছ, আজও পয়সার পরিবর্তে দামি পোশাক নিয়ে আমাকে পার করে দাও।'

'সব দিয়ে দিলে আপনার কী হবে? আপনার কি পোশাকের দরকার নেই?'

'আমার অন্যত্র যাবার ইচ্ছা নেই। তোমার একখানা পুরনো কাপড় আমাকে দিও। আমি তোমার সহকারী কিংবা শিক্ষানবিশ হয়ে থাকতে পারলে খুশি হব। নৌকা চালানোর কৌশল শিখতে হবে আমাকে।'

মাঝি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল অচেনা যাত্রীর মুখের দিকে। তারপর বলল, 'আমি চিনেছি তোমাকে। তুমি একদিন আমার কুটিরে রাত কাটিয়েছ। সে অনেকদিনের কথা—হয়তো বিশ বছর হবে। আমি তোমাকে নদী পার করে দিয়েছিলাম; আমরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিলাম বন্ধুর মতো। তখন তুমি সন্ন্যাসী ছিলে। তোমার নাম আজ মনে করতে পারছি না।'

'আমার নাম সিদ্ধার্থ।' আমাকে যখন দেখেছিলে তখন আমি ছিলাম সন্ন্যাসী।

'সিদ্ধার্থ, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার নাম বাসুদেব। আজ তুমি আমার অতিথি। রাতে তুমি আমার কুটিরেই থাকবে এবং আমাকে শোনাবে তোমার কাহিনী; কোথা থেকে এলে, এবং কেনই-বা মূল্যবান পোশাকের ওপর বিতৃষ্ণা জেগেছে।'

মাঝনদীতে এসে বাসুদেব জোরে জোরে দাঁড় টানতে লাগল। দারুণ স্রোত। কিন্তু তবু চাঞ্চল্য নেই বাসুদেবের। সে উল্টাদিকের গলুইয়ের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সরল

দুই বাহু দিয়ে শান্তচিত্তে টানছে। সিদ্ধার্থ চুপ করে বসে বসে বাসুদেবের দাঁড় টানা দেখতে লাগল; মনে পড়ল, একদিন সেই সন্ন্যাসজীবনে এই লোকটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিল। কৃতজ্ঞচিত্তে সে গ্রহণ করল বাসুদেবের আমন্ত্রণ। তীরে পৌঁছে সে নৌকা বাঁধতে সাহায্য করল বাসুদেবকে। বাসুদেব সিদ্ধার্থকে নিয়ে এল তার কুটিরে; পানি আর রুটি দিল খেতে, তৃপ্তির সাথে খেল সিদ্ধার্থ। সবচেয়ে ভালো লাগল পাকা আম, বাসুদেব কুড়িয়ে এনেছিল।

পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠেছে; সূর্যাস্তের বিলম্ব নেই। সিদ্ধার্থ ও বাসুদেব নদীর ধারে একটা গাছের গুঁড়ির উপরে এসে বসল। সেই শান্ত পরিবেশে নদীকে সাক্ষী রেখে সিদ্ধার্থের আত্মকাহিনী অকপটে বলা সহজ। তার জন্য পরিবার, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং হতাশা কিছুই সে গোপন করল না। সিদ্ধার্থের কথা শেষ হল গভীর রাতে।

বাসুদেব মনোযোগসহকারে শুনল সিদ্ধার্থের কাহিনী। তার জন্ম, শৈশব, অধ্যয়ন, পথের সন্ধান, সুখ-সম্ভোগ এবং আকাঙ্ক্ষার কথা—সব শুনল মন দিয়ে। অন্য লোকের কথা কী করে নীরবে আগ্রহের সাথে শুনতে হয় পাটনী সে কৌশল জানত। এটা তার মস্তবড় গুণ; এ গুণ খুব কম লোকের আছে। একটি কথাও সে বলেনি, তবু সিদ্ধার্থ অনুভব করেছে বাসুদেব যেন প্রত্যেকটি শব্দের জন্য নীরবে অপেক্ষা করে আছে, এবং উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রত্যাশিত শব্দটি তার অন্তরে প্রবেশ করছে, একটি কথাও সে হারিয়ে যেতে দেয়নি; বাসুদেবের প্রতীক্ষার মধ্যে ধৈর্যহীনতা নেই, নেই নিন্দা কিংবা প্রশংসা; কান পেতে শুধু শুনেছে। সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল, তার জীবনের মধ্যে, সংগ্রাম ও বেদনার মধ্যে আবিষ্ট হয়ে যেতে পারে, ডুবে যেতে পারে, এমন শ্রোতা পাওয়া কী ভাগ্যের কথা!

সিদ্ধার্থের কাহিনীর শেষের দিকে যখন সে গভীর হতাশায় নদীর তীরে গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়বার কথা, পবিত্র 'ওম্'-ধ্বনির কথা এবং ঘুম থেকে জেগে নদীর প্রতি নতুন প্রেমের কথা বলছিল, বাসুদেব তখন চোখ বন্ধ করে দ্বিগুণ মনোযোগসহকারে শুনতে লাগল সে কাহিনী; সে সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে গেল সিদ্ধার্থের আত্মচরিতের মাঝে।

সিদ্ধার্থের কাহিনী শেষ হল। অনেকক্ষণ চুপ করে বাসুদেব বলল, 'আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই; নদী তোমার সঙ্গে কথা বলেছে, নদী তোমাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছে, তাই তুমি তার কথা শুনতে পেয়েছ। বেশ, খুব ভালো কথা। সিদ্ধার্থ, তুমি আমারও বন্ধু; এসো, আমার সাথে থাকো। একদা আমার স্ত্রী ছিল, তার শয্যা থাকত আমার শয্যার পাশে। অনেক দিন হল সে মারা গেছে, বহুদিন আমি একা। তুমি এসো, আমরা দুজনে একত্রে থাকব। দুজনের জন্য থাকা-খাওয়ার অভাব হবে না।'

'ধন্যবাদ', সিদ্ধার্থ বলল, 'ধন্যবাদের সাথে তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। বাসুদেব, এমন মনোযোগ দিয়ে তুমি যে শুনেছ আমার জীবনকথা, সেজন্যও তোমাকে ধন্যবাদ। সংসারে অতি অল্প লোকই আছে যারা জানে কী করে অপরের কথা শুনতে হয়, সত্যি তোমার মতো শ্রোতা আমি আর দেখিনি। এই গুণটিও আমাকে তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে।'

'হ্যাঁ শিখবে বৈকি!'—বলল বাসুদেব। 'কিন্তু আমার কাছে নয়। নীরবে মন দিয়ে অন্যের কথা শুনবার বিদ্যা শিখেছি নদীর কাছ থেকে; তুমিও নদীর কাছ থেকে তা শিখবে। নদী সব জানে; নদী সব তোমাকে শেখাতে পারে। এর মধ্যেই নদী তোমাকে শিখিয়েছে নিম্নাভিমুখী হয়ে গভীরতায় ডুবে যাওয়া ভালো। তাই ধনী ও যশস্বী সিদ্ধার্থ নৌকার দাঁড়ি হবে; তাই সুপণ্ডিত ব্রাহ্মপুত্র সিদ্ধার্থ মাঝি হতে চলেছে। এ তো তুমি নদীর কাছ থেকেই শিখেছ। নদীর কাছ থেকে আর একটি জিনিস তুমি শিখবে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, 'বাসুদেব, সেটা কী?'

বাসুদেব উঠে দাঁড়াল, বলল, 'অনেক রাত হয়েছে, চলো এবার শুতে যাই। বন্ধু, সে জিনিস যে কী তা আমি বলতে পারব না। একদিন তুমি তা খুঁজে বের করবে, হয়তো-বা এখনই জানো। আমি পণ্ডিত নই; কী করে ভেবেচিন্তে মনের কথা প্রকাশ করতে হয় তা-ও জানা নেই। আমি জানি কী করে মন দিয়ে শুনতে হয় এবং ভক্তি করতে হয়; এ ছাড়া আর কিছুই শিখিনি। যদি বলবার এবং দেখবার ক্ষমতা থাকত তাহলে আচার্য হতে পারতাম; কিন্তু তা হতে পারিনি, হয়েছি শুধু খেয়ানৌকার মাঝি, যাত্রীদের নদী পার করে দিই। হাজার হাজার লোককে নদী পারাপার করে দিয়েছি; তাদের কাছে নদী শুধু পথের বাধা। সেসব পথিকের কেউ অর্থের সন্ধানে, কেউ ব্যবসায়ের অভিপ্রায়ে, কেউ বিয়ের উদ্দেশ্যে, আবার কেউ-বা তীর্থ দর্শনের জন্য ভ্রমণে বেরিয়েছে; নদী তাদের ভ্রমণে বাধা সৃষ্টি করেছে; খেয়ানৌকার মাঝি সে বাধা দূর করতে তাদের তাড়াতাড়ি নদী পার করে দিয়েছে। কিন্তু সেই হাজার হাজার পথিকের মধ্যে অল্প কয়েকজন—হয়তো চার-পাঁচজন—নদীকে পথের বাধা বলে মনে করেনি। নদীর গোপন বাণী শুনতে পেয়েছে, আমার মতো তারাও নদীর পবিত্র রূপটি দেখতে পেয়েছে। সিদ্ধার্থ, চলো এবার ঘুমোতে যাই।'

সিদ্ধার্থ মাঝির সাথে গেল। নৌকার দেখাশুনা কী করে করতে হয় তা শিখে নিল সিদ্ধার্থ। খেয়াঘাটে যখন কাজ থাকে না তখন সে বাসুদেবের সাথে যায় ধানক্ষেতে, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে, অথবা কলার কাঁদি কেটে আনে গাছ থেকে। সিদ্ধার্থ দাঁড় তৈরি করেছে। যা-কিছু সে করে, যা-কিছু সে শেখে, সবই তাকে আনন্দ দেয়; দিন ও মাসগুলো পাখির পাখনার মতো দ্রুত উড়ে চলে যায়। বাসুদেব যা শিখিয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি সে শিখেছে নদীর কাছে। এই শেখার শেষ নেই, নদী সর্বদা কিছু-না-কিছু শেখার সুযোগ এনে দেয়। সবচেয়ে বড় জিনিস নদী শিখিয়েছে শোনার বিদ্যা। কী করে প্রশান্ত চিত্তে, ধৈর্য ধরে, মুক্ত অন্তরে শুনতে হয়, সে কৌশল। শ্রোতার মনে ক্রোধ, কামনা ও মতামতের ছায়া না ফেলে শোনার বিদ্যা।

বাসুদেবের সাথে আনন্দেই দিন কাটছে সিদ্ধার্থের। তারা কেউ বড় একটা কথা বলে না; প্রয়োজন হলে অল্প সুচিন্তিত দু-একটি কথা বলে। বাসুদেব বাক্যবিলাসী নয়; তার মুখ থেকে কথা বের করতে সিদ্ধার্থ কদাচিৎ সক্ষম হয়।

একদিন সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, 'সময় বলে-যে কোনো জিনিস নেই এ গোপন তত্ত্বটা কি তুমি নদীর কাছ থেকে শিখেছ?'

উজ্জ্বল হাসিতে বাসুদেবের মুখ ভরে গেল। বলল, 'হ্যাঁ সিদ্ধার্থ। তুমি কী জানতে

চাও? তুমি বলতে চাও যে নদী সর্বত্র আছে; সে আছে উৎপত্তিস্থলে, মোহনায়, জলপ্রপাতে, খেয়াঘাটে, স্রোতধারায়, সমুদ্রে, পর্বতে এবং সর্বত্র। নদীর কাছে একমাত্র বর্তমানই সত্য; অতীতের বা ভবিষ্যতের ছায়া পড়ে না তার বুকে?'

'ঠিক তাই', সিদ্ধার্থ বলল। 'এ সত্য জানার পর নিজের জীবন পর্যালোচনা করে দেখলাম আমার জীবনও নদীর মতো; বালক সিদ্ধার্থ, পরিণত বয়স্ক সিদ্ধার্থ, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থ শুধু ছায়ার পর্দা দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন; আসলে কোনো পার্থক্য নেই, সব এক সূতায় গাঁথা। সিদ্ধার্থের পূর্বজীবন অতীতে হারিয়ে যায়নি, তার মৃত্যু এবং ব্রহ্মের সাথে মিলনও ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করছে না। কিছুই অতীত হয়ে যায়নি, ভবিষ্যতের জন্যও কিছু অপেক্ষা করে নেই; সবকিছুর অস্তিত্ব আছে বর্তমানে।'

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কথা বলছে সিদ্ধার্থ। এ নতুন আবিষ্কার তাকে বড় আনন্দ দিয়েছে। তাহলে মানুষের সকল দুঃখ, ভয় এবং আত্মপীড়ন কি সময়ের জন্যই নয়? সংসারের সকল পাপ ও বেদনাই কি জয় করা যায় না সময়কে পরাজিত করলে? অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সময়কে খণ্ডিত করবার মোহ থেকে মুক্তি পেলে? আনন্দে উচ্ছল হয়ে কথা বলছে সিদ্ধার্থ; কিন্তু বাসুদেব একটি কথাও বলল না, একবার শুধু হাসিসমুজ্জ্বল চোখে তার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর সিদ্ধার্থের কাঁধে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে চলে গেল নিজের কাজে।

বর্ষাকালে নদী আবার ফুলে উঠল, তার গর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করল : নদীর গর্জনের মধ্যে বহু কণ্ঠের ধ্বনি মিলিত হয়েছে এ-কথা ঠিক সত্য নয়, বন্ধু? এর মধ্যে কি রাজা, যোদ্ধা, ষাঁড়, নিশাচর পাখি, গর্ভবতী নারী, শোকার্ত মানুষ এবং এমনি হাজার হাজার প্রাণীর কণ্ঠস্বর মিলিত হয়নি?'

বাসুদেব মাথা নেড়ে বলল, 'সত্যি তাই, নদীর ধ্বনির মাঝে সকল প্রাণীর সুর মিলিত হয়েছে।'

সিদ্ধার্থ আবার বলল, 'নদীর লক্ষ লক্ষ স্বর একসঙ্গে যদি কেউ শুনতে পায়, তাহলে নদী কোন্ শব্দটি উচ্চারণ করে তা কি জানো?'

আনন্দে হেসে উঠল বাসুদেব। সিদ্ধার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে তার কানে চুপি চুপি উচ্চারণ করল পবিত্র 'ওম্'। সিদ্ধার্থের কানেও ঠিক এই শব্দটিই ভেসে এসেছে নদীর হাজারো কলধ্বনি ছাপিয়ে।

সময়ের সাথে সাথে সিদ্ধার্থের চেহারা ঠিক বাসুদেবের মতো হয়ে উঠতে লাগল। বাসুদেবের মতো সিদ্ধার্থের হাসিও আনন্দোজ্জ্বল, মুখের বলিরেখার ভাঁজে ভাঁজে সেই হাসির বিদ্যুৎধারা বয়ে যায়; তাদের দুজনের হাসি কখনো শিশুর মতো সরল, কখনো-বা বার্ধক্যের ছায়ায় ম্লান। এই দু'মাঝিকে একত্র দেখে অনেক পথিক ধরে নিয়েছে তারা দু-ভাই। প্রায়ই দু-বন্ধু নদী তীরে গাছের গুঁড়ির উপর এসে বসত। নীরবে বসে বসে পানির কলধ্বনি শুনত; তাদের কাছে এটা শুধুই পানির ধ্বনি নয়, এ হল জীবনের সুর, অস্তিত্বের ঘোষণা, নিরন্তর রূপ পরিবর্তনের সরব ইঙ্গিত। প্রায়ই নদীর কথা চুপ করে শুনতে শুনতে দুজনের মনে জেগে উঠত একই ভাবনা; হয়তো আগের দিনের কোনো আলোচনা, কোনো পথিকের কথা, মৃত্যুর চিন্তা, অথবা ছেলেবেলার স্মৃতিকে

কেন্দ্র করে এই ভাবনা দুজনের মনে একই সময়ে জেগে উঠত। আবার কখনো নদী একই সময়ে দুজনকে কোনো ভালো কথা বললে তারা পরস্পরের দিকে মুখ তুলে তাকাত, তাদের মনে থাকত একই চিন্তা, দুজনের মনে একসঙ্গে যে প্রশ্ন জাগত, তার একটি উত্তর দুজনকেই সন্তুষ্ট করত।

অনেক পথিক অনুভব করত, খেয়ানৌকা এবং মাঝি দুজনের মধ্যে যেন কী একটা দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। কখনো কখনো এমন হয়েছে, একজন যাত্রী হয়তো মাঝির মুখের দিকে একবার চেয়ে নিজের জীবনের কাহিনী বলতে আরম্ভ করেছে, বলছে তার দুঃখের কথা, স্বীকার করেছে সকল দুষ্কৃতি, এবং তারপর প্রার্থনা করেছে সান্ত্বনা ও উপদেশ। কেউ কেউ হয়তো নদীর বাণী শোনার জন্য তাদের কুটিরে রাত কাটাবার অনুমতি প্রার্থনা করত : কখনো কখনো নানা বিচিত্র লোক এসে উপস্থিত হত তাদের সম্বন্ধে জনশ্রুতি শুনে। খেয়াঘাটের দুজন বিজ্ঞ ব্যক্তির কথা তারা শুনেছে; দেখতে এসেছে তারা জাদুকর, নাকি সত্যি পুণ্যাত্মা। কৌতূহলী পথিকরা নানা প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পায়নি; কোথায়-বা জাদুকর, কোথায়-বা জ্ঞানী পুরুষ! তারা দেখা পেত দুটি সহৃদয় বৃদ্ধের; মুখে কথা নেই, বোবা বলে সন্দেহ হয়; বিদেশি যাত্রীর চোখে তারা অস্বাভাবিক, হয়তো-বা নির্বোধ। যারা জিজ্ঞাসু হয়ে এসেছে তারা হেসে বলেছে, এমন গুজব যারা ছড়ায় তারা কী বোকা, কী অন্ধ বিশ্বাস তাদের!

এর মধ্যে কত বছর পার হয়ে গেল, কেউ হিসাব রাখেনি। একদিন কয়েকজন বৌদ্ধভিক্ষু খেয়াঘাটে এসে অনুরোধ করল নদী পার করে দিতে। মাঝি তাদের মুখ থেকে শুনল ভগবান বুদ্ধ অত্যন্ত পীড়িত, এখন শেষবারের মতো নশ্বরদেহ ত্যাগ করে নির্বাণ লাভের মুহূর্ত আসন্ন; তাই ভিক্ষুরা দ্রুত ছুটে চলেছে তাঁর শয্যাপাশে। অল্প পরেই এল আর একদল ভিক্ষু; তারপর আর একদল—আরো একদল; ভিক্ষু ছাড়াও দলে দলে আসছে কত পথিক; সকলের মুখে শুধু বুদ্ধের আসন্ন দেহত্যাগ ও নির্বাণের কথা। আর সব কথা তারা ভুলে গেছে। সামরিক অভিযানে যোগ দেবার জন্য যেমন চারদিক থেকে লোক ছুটে আসে, রাজার অভিষেক উৎসবে প্রজার দল যেভাবে রাজধানীতে মিছিল করে জমায়েত হয়, তেমনি চুম্বকের আকর্ষণে মৌমাছির ঝাঁকের মতো পথিকের দল ব্যাকুল হয়ে ছুটে চলেছে সেই তপোবনে, যেখানে বুদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত; সেখানে পৃথিবীর একটি মহৎ ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটতে চলেছে; সেখানে এ-যুগের ত্রাণকর্তা চিরযুগে প্রবেশ করে অমরত্ব লাভ করবেন।

যাত্রীদের ব্যগ্রতা দেখে আজকাল সিদ্ধার্থের কেবলই মনে পড়ে মৃত্যুপথযাত্রী সেই মহর্ষির কথা, যাঁর কণ্ঠস্বর একদিন হাজার হাজার লোকের অন্তর উজ্জীবিত করেছে, যাঁর বাণী সে নিজেও শুনেছে এবং যাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে একদিন তার মন ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাঁর কথা ভাবলেই মন অনুরাগে ভরে যায়; মনে পড়ে যায় তিনি মুক্তির কোনো পথ নির্দেশ করেছেন; আর একদিন তারুণ্যের চপলতায় তাঁকে যেসব কথা বলেছিল তা মনে পড়লে আজ হাসি পায়; সেসব কথায় ঔদ্ধত্য ও অকালপক্কতার পরিচয় ছিল। যদিও তাঁর উপদেশ সে গ্রহণ করতে পারেনি, তবু সেই সাক্ষাতের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সিদ্ধার্থ মনে মনে গৌতমের সাথে অভিন্নতা উপলব্ধি

করেছে। যে প্রকৃতিজিজ্ঞাসু, যে সত্যি কিছু পেতে চায়, সে কখনো অন্যের উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান সার্থক হয়েছে, যিনি পথের সন্ধান পেয়েছেন, তিনি প্রত্যেক পথ, প্রত্যেক লক্ষ্য, বিচার করে অনুমোদন করার অধিকারী। হাজার হাজার সাধকের সাথে তাঁর আত্মার যোগ আছে, তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে থাকতে পারেন না।

বুদ্ধের আসন্ন মৃত্যুসংবাদ শুনে তাঁর দর্শনলাভের আশায় তীর্থযাত্রীর মতো হাজার হাজার লোক পথ চলছে। একদিন কমলাও এসে যোগ দিল তাদের সাথে। অপরূপ সুন্দরী বারাঙ্গনা তার পূর্বজীবন ত্যাগ করেছে; সে তার উদ্যান দান করেছে গৌতমের শিষ্যদের সেবার জন্য; সে বুদ্ধের শিষ্যত্বগ্রহণ করেছে। যেসব মহিলা তীর্থযাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবার ব্রত গ্রহণ করেছে, কমলা এখন তাদেরই একজন। বুদ্ধের দেহত্যাগ সন্নিকট জেনে সামান্য একখানা শাড়ি পরে এবং ছেলের হাত ধরে পথে বেরিয়ে এসেছে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে কমলা এসে পৌঁছেছে নদীতীরে। ছেলে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বায়না ধরেছে বাড়ি ফিরে যাবার; সে চায় বিশ্রাম, চায় খাবার। প্রায়ই মুখ ফুলিয়ে বসে থাকে; কখনো-বা কাঁদে। প্রায়ই ছেলেকে নিয়ে বসে থাকতে হয় মা-কে। মায়ের নিষেধ না-শুনে সে নিজের জিদ নিয়ে গোঁ ধরে। ছেলেকে খাওয়ানো, সান্ত্বনা দেওয়া এবং তিরস্কার করা কমলার সারাদিনের কাজ। সে বুঝতে পারে না কেন তার মা কোনো এক অজানা জায়গার উদ্দেশে এই ক্লান্তিকর, দুঃখজনক তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছে। কোনো এক অপরিচিত পুণ্যাত্মা মৃত্যুপথযাত্রী— তাতে বালকের কী আসে-যায়?

তীর্থযাত্রীরা বাসুদেবের খেয়াঘাটের কাছে এসে পড়েছে। পুত্র বলল, সে আর চলতে পারছে না, একটু বিশ্রাম করবে। কমলা নিজেও ক্লান্ত, ছেলে একটা কলা খেতে আরম্ভ করল; কমলা ছেলের পাশে মাটির উপরে শুয়ে পড়ল। শ্রান্তিতে তার চোখ বুজে এল অকস্মাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল কমলা। বালক চমকে চেয়ে দেখল মা'র মুখ আতঙ্কে শাদা হয়ে গেছে। আর দেখতে পেল একটা ছোট কালো সাপ কমলার শাড়ির ভাঁজ থেকে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

সাহায্যের আশায় তারা দুজনেই ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল নদীতীরে। একটু দূরেই খেয়াঘাট। কিন্তু কমলার চলনশক্তি হারিয়ে গেছে, সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বালক মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগল। বাসুদেব নৌকায় বসে ছিল, সে শুনতে পেল বালকের আর্তনাদ। বাসুদেব ছুটে এল; কমলাকে কোলে তুলে দ্রুত কুটিরে নিয়ে এল। বালক কাঁদতে কাঁদতে এল তার পিছে পিছে। সিদ্ধার্থ তখন সবেমাত্র উনুনে আগুন জ্বেলেছে; শব্দ পেয়ে মুখ তুলে চাইল। প্রথম চোখে পড়ল বালকের মুখ; এই মুখ মুহূর্তের মধ্যে তার মনে কী একটা অদ্ভুত আবছা স্মৃতি জাগিয়ে তুলল। তারপর বাসুদেবের কোলে দেখতে পেল কমলার সংজ্ঞাহীন দেহ। কমলাকে চিনতে দেরি হল না। বুঝতে পারল, এ বালক তারই ছেলে। অতীতের অস্পষ্ট স্মৃতি তাকে চঞ্চল করে তুলল। সিদ্ধার্থের হৃদয়ের স্পন্দন দ্রুত হল।

কমলার ঘা সযত্নে ধুয়ে দেওয়া হল। কিন্তু বিষ শরীরদেহে ছড়িয়ে পড়েছে, শরীর কালো হয়ে উঠেছে। বলকারক ঔষধ দেওয়ায় কমলার সংজ্ঞা ফিরে এল। সিদ্ধার্থের শয্যায় শুয়ে আছে কমলা। যে সিদ্ধার্থ একদিন তার জীবন প্রেম দিয়ে পূর্ণ করেছিল,

সে আজ ব্যগ্র হয়ে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। হঠাৎ কমলার মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে; তারপর পাংশু মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল; সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থের দিকে। ধীরে ধীরে কমলা বুঝতে পারল তার অবস্থা, মনে পড়ল সাপের দংশন; উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলের নাম ধরে ডাকল।

সিদ্ধার্থ বলল, 'ভেবো না, সে এখানেই আছে।'

কমলা আবার চোখ রাখল সিদ্ধার্থের চোখের ওপর। সর্বাঙ্গে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে, কথা বলতে কষ্ট হয়। আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, প্রিয়তম। তোমার মাথার চুল শাদা হয়ে গেছে। কিন্তু তবু একদিন ধূলিমলিন কৌপীনমাত্র সম্বল করে যে তরুণ সন্ন্যাসী আমার বাগানে প্রবেশ করেছিল তোমার আজকের চেহারার সাথে তার অদ্ভুত মিল আছে। তুমি যখন কামস্বামী ও আমাকে ছেড়ে এলে তখনকার চেহারা মনে পড়ে না; তোমার দিকে চেয়ে ভেসে ওঠে সে তরুণ সন্ন্যাসীর ছবি, যে একদিন প্রেমের পাঠ নিতে আমার কাছে গিয়েছিল। তোমার চোখ এখনো ঠিক তার মতোই আছে। হায়, আমিও বুড়ো হয়ে গেছি—খুব বুড়ো—আমাকে চিনতে পেরেছিলে?'

সিদ্ধার্থ হাসল; বলল, 'তোমাকে দেখেই চিনেছি, কমলা।'

কমলা ছেলেকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকে চিনেছ?—তোমার ছেলে।'

কমলার চোখ কী যেন খুঁজে বেড়াল কিছুক্ষণ, তারপর বন্ধ হয়ে গেল। বালক কেঁদে উঠল। সিদ্ধার্থ তাকে কোলের উপর তুলে ধীরে ধীরে চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল, কান্না থামাবার চেষ্টা করল না। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে তার মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় শেখা একটি প্রার্থনার মন্ত্র। মৃদু সুরে গানের মতো সে আবৃত্তি করতে লাগল, দূর অতীতের শৈশব থেকে মন্ত্রের শব্দগুলো স্মৃতিজড়িত হয়ে ভেসে আসতে লাগল। ছেলে একটু চুপ করল আবৃত্তি শুনে, তারপর কখন একসময় ফোঁপাতে ফোঁপাতে ঘুমিয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থ তাকে শুইয়ে দিল বাসুদেবের বিছানায়।

বাসুদেব উনুনে ভাত বসিয়েছে। সিদ্ধার্থ তার কাছে গিয়ে চুপি চুপি বলল, 'আর দেরি নেই।'

বাসুদেব নীরবে মাথা নাড়ল। উনুনের আলোয় তার স্নেহমাখা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কমলা আর একবার সংজ্ঞা ফিরে পেল। তার বিবর্ণ মুখে বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। সিদ্ধার্থ শান্তচিত্তে সে চিহ্ন পাঠ করল; সেই বেদনার অংশীদার হয়ে সে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। সিদ্ধার্থের ব্যগ্রতা অনুভব করতে কষ্ট হয় না কমলার। তার চোখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কমলা বলল, 'এখন দেখছি তোমার সে চোখ আর নেই, যেন নতুন দৃষ্টি পেয়েছে। একেবারে নতুন হয়ে গেছে তোমার চাহনি। তোমাকে যে আজও সিদ্ধার্থ বলে চিনতে পারছি, সেটাই আশ্চর্য। তুমি সিদ্ধার্থ, অথচ যে আমার জীবনে এসেছিল ঠিক তার মতো নও।'

সিদ্ধার্থ কিছুই বলল না, নীরবে কমলার চোখের ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল।

কমলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কী পেয়েছ? শান্তিলাভ করেছ?'

সিদ্ধার্থ এবারো কোনো কথা বলল না, শুধু নীরবে তার হাত দিয়ে কমলার হাতের উপর একটু মৃদু চাপ দিল।

কমলা বলল, 'হ্যাঁ, বুঝেছি। আমিও শিগগির মোক্ষলাভ করব।'

'তুমি তা পেয়েছ, কমলা', চুপি চুপি সিদ্ধার্থ বলল।

কমলা একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল সিদ্ধার্থের দিকে। বুদ্ধকে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে সে পথে বেরিয়েছিল; তাঁর মুখমণ্ডল থেকে যে শান্তির জ্যোতি বিকীর্ণ হয়, তার সংস্পর্শে এসে শান্তিলাভ করবে এই ছিল কমলার বহুদিনের ইচ্ছা। কিন্তু বুদ্ধের পাদস্পর্শ করা হল না, দেখা পেল সিদ্ধার্থের। তবু এই ভালো; বুদ্ধের দেখা পেলে যে তৃপ্তিলাভ করত, সিদ্ধার্থের দেখা পেয়ে তাই সে পেয়েছে। এ-কথা সে বলতে চাইল সিদ্ধার্থকে, কিন্তু পারল না, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে শুধু চুপ করে সিদ্ধার্থের মুখের দিকে চেয়ে রইল। সিদ্ধার্থ দেখল কমলার চোখ থেকে ধীরে ধীরে জীবনের জ্যোতি মিলিয়ে যাচ্ছে। শেষবারের মতো তার চোখ বেদনায় কালো হয়ে উঠল। দারুণ যন্ত্রণায় তার দেহ শেষবারের মতো কেঁপে উঠে স্তব্ধ হয়ে গেল। সিদ্ধার্থ সন্তর্পণে আঙুল দিয়ে বিস্ফারিত চোখদুটি বন্ধ করে দিল চিরদিনের জন্য।

অনেকক্ষণ ধরে সে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল কমলার পাণ্ডুর মুখের দিকে। সেই শীর্ণ মুখ, কোঁকড়ানো ঠোঁটের দিকে চেয়ে চেয়ে সিদ্ধার্থের মনে পড়ে গেল, তার জীবনের বসন্তঋতুতে সে এই ঠোঁটদুটিকে তুলনা করেছিল টাটকা কাটা ডুমুরের সঙ্গে। অনেকক্ষণ ধরে কমলার বিবর্ণ মুখের কান্তি আর বলিরেখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সিদ্ধার্থ যেন নিজের পাণ্ডুর, মৃতমুখও দেখতে পেল। আজ কমলার যে অবস্থা একদিন তারও তেমনই হবে। আবার চোখের সামনে ভেসে উঠল তাদের দুজনের মুখ—তারুণ্যে টলমল; রক্তিম অধর, কামনাদীপ্ত চোখ, সে দুটি মুখ অতীতে হারিয়ে যায়নি, তাদের অস্তিত্ব সে এখনো অনুভব করছে। এই জীবনের অনুভূতি তাকে অভিভূত করে ফেলল। আজ লাশের সম্মুখে বসে সে উপলব্ধি করল কোনো জীবনের মৃত্যু নেই, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অমরত্ব লাভ করে, কিছুই হারায় না।

বাসুদেবের ভাত নেমেছে, কিন্তু কেউ তা স্পর্শ করল না। বসুদেব এককোণে খড় বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সিদ্ধার্থ কুটিরের বাইরে বসে সারারাত কাটিয়ে দিল, নিস্তব্ধ রাতে নদীর কথা স্পষ্টতর হয়ে ভেসে আসছে তার কানে। সিদ্ধার্থ অতীতের মধ্যে ডুবে গেল। শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য এবং জীবনের সবগুলো স্তর যুগপৎ তাকে ঘিরে ধরেছে, বিচলিত করছে। মাঝে মাঝে সে উঠে এসেছে, দরজায় কান পেতে শুনেছে—ছেলে ঘুমিয়ে আছে, না কাঁদছে।

ভোরে, সূর্য ওঠার আগে, বাসুদেব এসে দাঁড়াল বন্ধুর পাশে; বলল, 'তুমি একটুও ঘুমোওনি?'

'না, বাসুদেব, আমি এখানে বসে বসে নদীর কথা শুনেছি। নদী আমাকে অনেক কথা বলেছে, অনেক মহৎ ভাবনায় আমার মন পূর্ণ করেছে, দিয়েছে ঐক্যানুভূতির ঐশ্বর্য।'

'সিদ্ধার্থ, তুমি দুঃখ পেয়েছ, কিন্তু দেখছি সে দুঃখ অন্তরে প্রবেশ করে তোমার জীবনকে কালো করতে পারেনি।'

'না বন্ধু, তা পারেনি। কেন দুঃখ করব? একদিন আমার অর্থ ছিল, আমি সুখী ছিলাম। আজ আমি তারচেয়েও সুখী, তারচেয়েও ঐশ্বর্যশালী। আমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছি।'

'তোমার ছেলেকে আমিও সাদরে গ্রহণ করেছি। কিন্তু, সিদ্ধার্থ, চলো এবার কাজে যাই, অনেক কাজ পড়ে আছে। আমার স্ত্রী যে শয্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে, কমলা তারই উপর শুয়ে আছে। যে টিলার উপর আমার স্ত্রীর চিতা রচনা করেছিলাম, কমলার জন্য সেখানেই চিতা করব।'

চিতা তৈরি শেষ হল, কিন্তু বালকের ঘুম তখনো ভাঙেনি।

পুত্র সংবাদ

ভীত কিশোর কাঁদতে কাঁদতে মা'র শেষকৃত্য সম্পন্ন করল। সিদ্ধার্থ তাকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছে; বাসুদেবের কুটিরকে নিজের বাড়ির মতো স্বচ্ছন্দভাবে গ্রহণ করতে বলেছে, তবু তার ভয় ভাঙেনি, বিষণ্নমুখে হাসি ফোটেনি। যে পাহাড়ে মা'র চিতা সাজানো হয়েছিল, দিনের পর দিন সেই পাহাড়ের উপর গিয়ে বসে চেয়ে থাকে দূর দিগন্তে; মনের কথা কাউকে বলতে পারে না; নিষ্ঠুর ভাগ্যের সাথে নীরবে একাকী সংগ্রাম করে চলেছে।

সিদ্ধার্থ পুত্রের সাথে ব্যবহার করত গভীর সহানুভূতির সাথে; তাকে একা থাকতে দিত, শোকের মর্যাদা ছিল তার কাছে। সিদ্ধার্থ বুঝত ছেলে এখনো তাকে আপন বলে গ্রহণ করতে পারছে না; সে-ও পিতার মতো তাকে ভালোবাসতে পারেনি। ক্রমশ সিদ্ধার্থ দেখল, এগারো বছরের এই কিশোর মা'র আদর পেয়ে বড় হয়েছে, ধনীদের মতো জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত; নরম বিছানা, সুস্বাদু খাবার এবং ভৃত্যের সেবা পেয়ে এসেছে এতদিন। আজ হঠাৎ এই দরিদ্রের কুটিরে অনভ্যস্ত কঠোর জীবনের মধ্যে পড়ে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না সে। সিদ্ধার্থ তার জন্য চাপও দিল না; সেই অবস্থায় যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়া যেতে পারে তার ত্রুটি হল না; সে পুত্রের জন্য যতটা সম্ভব ভালো খাদ্য সংগ্রহ করে আনত। সিদ্ধার্থের আশা ছিল সেই দিয়ে একটু একটু করে পুত্রকে জয় করে নেবে।

ছেলেকে পেয়ে সিদ্ধার্থের মনে হয়েছিল তার জীবনে এসেছে নতুন সুখ, নতুন ঐশ্বর্য। সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু সিদ্ধার্থের আশা পূর্ণ হল না। পুত্রের একগুঁয়েমি এবং প্রতিকূলতা দূর হবার লক্ষণ নেই; সে দাম্ভিক, উদ্ধত, কর্মবিমুখ; প্রবীণদের সম্মান করে না, বাসুদেবের গাছ থেকে ফল চুরি করে আনে। পুত্রের স্বভাবের পরিচয় পেয়ে সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল পুত্র তার জন্য সুখ ও শান্তি নিয়ে আসেনি, এনেছে শুধু দুঃখ ও ঝঞ্ঝাট। কিন্তু এরই মধ্যে সিদ্ধার্থ পুত্রকে ভালোবেসে ফেলেছে; এই ভালোবাসার

সাথে দুঃখ ও যন্ত্রণা জড়িত থাকলেও ক্ষতি নেই, তবু পুত্রহীন জীবনের সুখ ও শান্তি সে আর ফিরে পেতে চায় না।

ছেলে কুটিরে থাকে, তাই দুই বন্ধু দিনের কাজ ভাগ করে নিল। বাসুদেব থাকে খেয়ানৌকা নিয়ে, সিদ্ধার্থ ঘরের কাজ করে, প্রয়োজন হলে মাঠে যায়। পুত্রের কাছে থাকবার সুযোগ পেল সিদ্ধার্থ।

মাসের পর মাস সিদ্ধার্থ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে কবে ছেলে তাকে বুঝতে পারবে, গ্রহণ করবে তার ভালোবাসা, প্রতিদান দেবে সেই ভালোবাসার। পিতা-পুত্রের এই দ্বন্দ্ব বাসুদেবও নীরবে লক্ষ করছে। একদিন বালক ক্রুদ্ধ হয়ে দুটো ভাতের হাঁড়ি পর পর ভেঙে ফেলল। দুঃখ-বেদনায় নির্বাক হয়ে ছেলের ঔদ্ধত্য দেখল সিদ্ধার্থ।

বাসুদেব এসে তাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে বলল, 'সিদ্ধার্থ, আমাদের বন্ধুত্বের দাবিতে তোমাকে একটা কথা বলছি, এর জন্য ক্ষমা করো। আমি লক্ষ করে দেখছি, তুমি আজকাল বড় উদ্বিগ্ন থাকো, তোমার মনে সুখ নেই। বন্ধু, ছেলে তোমাকে দুঃখ দিচ্ছে এবং সে দুঃখের আমিও সমান অংশীদার। যে পক্ষীশাবকটি ঘরে নিয়ে এসেছ সে অন্য একধরনের জীবনে, অন্য একধরনের নীড়ে বাস করতে অভ্যস্ত। তোমার মতো বীতস্পৃহ হয়ে সে নগরের ঐশ্বর্য ত্যাগ করে আসেনি; ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিলাসের জীবনকে ত্যাগ করে বাঁচতে হচ্ছে তাকে। আমি নদীকে প্রশ্ন করেছি, সে হেসে উঠেছে। হেসেছে তোমার এবং আমার নির্বুদ্ধিতায়। পানি ছুটে যাবে পানির কাছে, যৌবন মিলিত হতে চাইবে যৌবনের সঙ্গে। এখানে তোমার পুত্র সুখী হতে পারবে না। তুমি নদীকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, শোনো সে কী বলে।'

ব্যথিত চিত্তে সিদ্ধার্থ বন্ধুর মমতাভরা মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'ওকে ছেড়ে কী করে থাকব? আমাকে আরো কিছু সময় দাও, বন্ধু। ছেলের মন পাবার জন্য আমি সারাক্ষণ চেষ্টা করে চলেছি। ধৈর্য ও ভালোবাসা দিয়ে একদিন ওর হৃদয় জয় করতে পারব সে বিশ্বাস আমার আছে। একদিন নদী ওর সাথেও কথা বলবে। নদীর আহ্বানেই হয়তো ও এখানে এসেছে।'

বাসুদেবের মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল; বলল, 'নিশ্চয়, নদীর আহ্বানেই ও এসেছে; কারণ তোমার ছেলে তো অনন্ত জীবনের বাইরে নয়। কিন্তু এই অনন্ত জীবনধারার কোন্ পথে চলার, কোন্ কাজ করার এবং কোন্ দুঃখভোগের প্রয়োজনে এই আহ্বান এসেছে সে-কথা তুমি কিংবা আমি কেউ জানি না। তোমার ছেলের হৃদয় কঠিন এবং দাম্ভিকতায় পূর্ণ; সুতরাং তার দুঃখ সামান্য হবে না। সে অনেক দুঃখ ভোগ করবে, অনেক ভুল করবে, অনেক পাপ ও অন্যায় করবে। বন্ধু বলো তো, তুমি কি তোমার পুত্রকে শিক্ষা দিচ্ছ? সে কি তোমার কথা মেনে চলে? তুমি কি তাকে শাস্তি দাও, প্রহার কর?'

'না, বাসুদেব। আমি এসবের কিছুই করি না।'

'তা আমি জানতাম। তুমি তার ওপর কঠোর হতে পার না, তাকে শাস্তি দাও না, আদেশ কর না—কারণ তুমি জানো কঠোরতার চেয়ে মৃদুতার, পাথরের চেয়ে পানির এবং বলবত্তা অপেক্ষা ভালোবাসার শক্তি বেশি। খুব ভালো কথা। আমি তোমার ধৈর্যের প্রশংসা করি। কিন্তু তুমি যে তার প্রতি কঠিন হতে পার না, ওকে

শাস্তি দিতে পার না, সেটা কি তোমার দিক থেকে ভুল হচ্ছে না? তোমার ভালোবাসা দিয়ে কি ছেলেকে বন্দি করে রাখছ না? তোমার করুণা ও ধৈর্য প্রতিদিন বালকের ব্যবহারকে ধিক্কার দেয়; তার পক্ষে নিজের চরিত্র সংশোধন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে। তুমি এই গর্বিত, বখাটে বালককে জোর করে দুই বৃদ্ধের সঙ্গে ধরে রেখেছ। শুধু লবণ দিয়ে ভাত খাওয়াই যাদের কাছে বিলাসিতা, যাদের ভাবনা সম্পূর্ণ পৃথক, যাদের হৃদয় বুড়িয়ে গেছে, যাদের বুকের স্পন্দনের ছন্দ আলাদা--তাদের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য করছ এই কিশোরকে। এই পরিবেশের মধ্যে ছেলেকে জোর করে রেখে শাস্তি দিচ্ছ না কি?'

সিদ্ধার্থ বিহ্বল হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আমার কী করা উচিত?'

বাসুদেব বলল, 'ওকে শহরে নিয়ে যাও; নিয়ে যাও ওর মা'র বাড়িতে। কমলার পুরনো চাকররা তো এখনো সে বাড়িতেই আছে, তাদের কাছে নিয়ে যাও। যদি সেখানে কেউ না থাকে তাহলে ছেলেকে রেখে এসো কোনো গুরুর আশ্রমে। শুধু শিক্ষার জন্য নয়, সে আশ্রমই হবে তার নিজের জগৎ; পাবে কিশোরদের সাহচর্য। আমাদের জগৎকে সে কখনো নিজের বলে গ্রহণ করতে পারবে না। তুমি এ ব্যাপারে কোনোদিন ভেবে দেখনি?'

সিদ্ধার্থ বিষণ্ণকণ্ঠে বলল, 'তুমি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছ। আমিও এ-কথা ভেবেছি। কিন্তু যার হৃদয় এত কঠিন সে কী করে সংসারে বাস করবে? সে কি শ্রেষ্ঠত্বাভিমানী হয়ে উঠবে না? সে কি বিলাস ও ক্ষমতার মোহে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে না? পুত্র কি পুনরাবৃত্তি করবে না পিতার ভুল? সংসারের মাঝে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যাবার সম্ভাবনা কি নেই তার?'

বাসুদেব হাসল। সিদ্ধার্থের বাহু স্পর্শ করে বলল, 'বন্ধু, তোমার প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা কর নদীকে। শোনো নদীর উত্তর, হেসে উড়িয়ে দাও তোমার যত আশঙ্কা। তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর তোমার ভুল থেকে পুত্র শিক্ষালাভ করবে, ঐ ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে রক্ষা পাবে সে? কেমন করে বাঁচবে? উপদেশ দিয়ে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, সৎপথের ইঙ্গিত দিয়ে? বন্ধু, ব্রাহ্মণকুমার সিদ্ধার্থের যে-গল্প একদিন আমাকে বলেছিলে সে-গল্পের শিক্ষা কি ভুলে গেছ? সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থকে পাপ, লোভ ও নির্বুদ্ধিতা থেকে কে রক্ষা করতে পেরেছে? পিতার ধর্মানুরাগ, গুরুর সদুপদেশ, তার নিজের জ্ঞান ও তত্ত্বানুসন্ধানের স্পৃহা কি বাঁচাতে পেরেছে তাকে? কোন্ পিতা, কোন্ গুরু, তাকে বিরত করতে পারত তার জীবনের নিজস্ব পথ ধরে চলতে? সংসারের মালিন্য জীবনকে করবে মলিন, পূর্ণ হবে পাপের পসরা, নিজের হাতে জীবনের পাত্র থেকে পান করবে তিক্ত পানীয়; বাধা দেবে কীভাবে? শুকনো উপদেশ থাকে ধুলায় পড়ে, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে এমনি করেই নিজস্ব পথ খুঁজে নিতে হয়। বন্ধু, তুমি কি ভেবেছ সংসারের এই কুটিল, কঠোর পথ অতিক্রম না করে কারো অব্যাহতি আছে? হয়তো ভাবছ তোমার বালকপুত্রের কথা। সে যেন দুঃখ, যন্ত্রণা ও মোহভঙ্গের বেদনা না পায় সেজন্য যে পথ তুমি একদিন অতিক্রম করেছ, সে পথ

থেকে তাকে নিবৃত্ত করতে চাও। কিন্তু পুত্রের মঙ্গল কামনায় দশবার প্রাণ দিলেও তার ভাগ্য তুমি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করতে পারবে না।'

একসাথে এত কথা বাসুদেব কখনো বলেনি। বন্ধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে সিদ্ধার্থ কুটিরে ফিরে এল উদ্বিগ্নচিত্তে। সারারাত ঘুমোতে পারল না। বাসুদেব নতুন কথা কিছু বলেনি। সব কথাই সে জানে। কিন্তু জানার চেয়ে পুত্রস্নেহ প্রবল; ছেলের প্রতি গভীর আসক্তি তাকে অন্ধ করেছে, সে পুত্রকে হারাবার আশঙ্কায় ব্যাকুল। এমন করে এর আগে সিদ্ধার্থ কারো কাছে আত্মসমর্পণ করেনি, অন্ধের মতো এমন করে আর কাউকে ভালোবাসেনি। কী গভীর বেদনা সে ভালোবাসায়, তবু কত সুখ!

সিদ্ধার্থ বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ করতে পারল না। ছেলেকে ত্যাগ করবে কেমন করে? দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পুত্র তাকে আদেশ করে, অসম্মানজনক ব্যবহার করতে সাহস পায়। সিদ্ধার্থ নীরবে অপেক্ষা করে। ধৈর্য ও স্নেহের অস্ত্র দিয়ে সিদ্ধার্থ প্রতিদিন বোবা যুদ্ধ করে যায়। আশা আছে, একদিন পুত্রকে জয় করবে। বাসুদেবও নীরবে অপেক্ষা করছে; সে বুঝতে পেরেছে বন্ধুর মনের কথা; মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের মতো সে অপেক্ষা করে আছে। দু'বন্ধুই সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি।

একদিন বালকের মুখের আদল লক্ষ করতে করতে চোখের সামনে ভেসে উঠল কমলার মুখ। হঠাৎ সিদ্ধার্থের মনে পড়ল অনেক দিন আগে কমলা একবার তাকে একটা কথা বলেছিল। কমলা অভিযোগ করেছিল, 'তুমি ভালোবাসতে পার না।' সিদ্ধার্থ স্বীকার করে নিয়েছিল এই অভিযোগ। নিজেকে সে তুলনা করেছিল আকাশের নক্ষত্রের সঙ্গে, উড়ন্ত ঝরাপাতার মতো। তবু কমলার অভিযোগের মধ্যে যে তিরস্কারের কাঁটা ছিল তাকে একেবারে উপেক্ষা করতে পারেনি সিদ্ধার্থ। এ-কথা সত্য, সিদ্ধার্থ ভালোবেসে আর-একজনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারেনি; কখনো প্রশ্রয় দেয়নি প্রেমের নির্বুদ্ধিতাকে। সিদ্ধার্থ ভাবত সাধারণ লোকের সাথে তার সবচেয়ে বড় পার্থক্য এখানেই। কিন্তু এখন পুত্রকে পেয়ে তাকে ভালোবেসে, তার কাছ থেকে দুঃখ পেয়ে সে সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মানুষের একজন হয়ে উঠেছে। পুত্রস্নেহ তাকে উন্মাদ করেছে, ভালোবাসার জন্য সে হয়েছে নির্বোধ। জীবনের শেষবেলায় এই প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করল এক অপূর্ব ও প্রবল ভালোবাসার। ভালোবাসা দিয়েছে গভীর দুঃখ; কিন্তু তবু এই ভালোবাসাই তাকে ঊর্ধ্বে তুলেছে, নবীন করেছে, দিয়েছে এমন এক ঐশ্বর্য যা আগে কখনো ছিল না।

আজ সিদ্ধার্থ অনুভব করল এই ভালোবাসা; এই অন্ধ পুত্রস্নেহ, সাধারণ মানুষের একটি স্বাভাবিক অনুভূতি। এই তো সংসার। সিদ্ধার্থ ভাবল, এই ভালোবাসাও ব্যর্থ নয়, এরও প্রয়োজন আছে জীবনে; কারণ ভালোবাসার বীজ রয়েছে মানুষের স্বভাবের মধ্যে। এই আবেগ, এই বেদনা, এই বোকামির অভিজ্ঞতাও লাভ করতে হয় জীবনে পূর্ণতার জন্য।

ইতিমধ্যে পুত্রস্নেহে অন্ধ পিতাকে সুযোগ এনে দেয় ভালোবাসার পাগলামি করতে, ছেলের হৃদয় জয় করার জন্য সাধনা করতে। পিতাকে মর্মাহত করে তার রুক্ষ মেজাজ। তার পিতার মধ্যে এমন কিছু নেই যা তাকে আকর্ষণ করতে পারে, এমন

কিছু নেই যাকে সে ভয় করবে। তার পিতা ভালো মানুষ, দয়ালু ভদ্রলোক; হয়তো ধর্মভীরু কিংবা সাধুপুরুষও হতে পারেন। কিন্তু এসব গুণ দিয়ে বালকের মন জয় করা যায় না। যে পিতা তাকে এই জীর্ণ কুটিরে বন্দি করে রেখেছে সেই পিতাকে দেখলেই তার মন বিরক্তিতে ভরে ওঠে; তার রূঢ় ব্যবহারের উত্তরে সিদ্ধার্থ শুধু হাসে। সকল অপমানের উত্তরে ঢেলে দেয় অফুরন্ত স্নেহ। পুত্রের সকল দুরন্তপনা সহ্য করে হাসিমুখে। বালক মনে করে ধূর্তবৃদ্ধ তাকে জয় করবার জন্য ক্ষমার কৌশল অবলম্বন করতে চায়। পিতা যদি তাকে তিরস্কার করতেন, দুর্ব্যবহার করতেন তার সঙ্গে; তাহলে বরং সে সুখী হত।

একদিন বালক স্পষ্ট করে বলল তার কথা, প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল পিতার বিরুদ্ধে। সিদ্ধার্থ শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে আনতে বলেছিল; বালক সে-কথায় কান না দিয়ে কুটিরে দাঁড়িয়ে রইল; ক্রুদ্ধ, উদ্ধত বালক মাটিতে পা ঠুকতে আরম্ভ করল; দুহাত মুষ্টিবদ্ধ করে মুখের ওপর চিৎকার করে ঘোষণা করল পিতার প্রতি তার ঘৃণা ও অবজ্ঞা।

'কেন, নিজে আনতে পার না?'--ছেলে চিৎকার করে উঠল। 'আমি তোমার চাকর নই। জানি তুমি আমাকে প্রহার কর না। কিন্তু সে কি আর এমনি? সাহস কর না বলে! ধর্মপরায়ণতা ও প্রশ্রয় দিয়ে তুমি সর্বদা আমাকে শাস্তি দাও, প্রমাণ করতে চাও আমি কত ছোট। তোমার ইচ্ছা আমি তোমার মতোই ধার্মিক, বিনয়ী ও বিজ্ঞ হব; কিন্তু তোমার ওপর আক্রোশ হচ্ছে বলেই সে পথে আমি যাব না; বরং চুরি করব, খুন করে নরকে যাব, তবু তোমার মতো হতে চাই না। তুমি আমার মা'র প্রেমিক হলেও তোমাকে আমি পিতা বলে স্বীকার করি না; তোমাকে ঘৃণা করি।'

এতদিনের ক্রোধ ও পুঞ্জীভূত অসন্তোষ আজ মুক্তি পেল উন্মত্ত কটূক্তির মধ্যে। এই বয়সে কঠোর জীবনযাপন করতে বাধ্য করেছে তার পিতা। তাই পিতার ওপর ক্রোধের শেষ নেই। সিদ্ধার্থের ওপর মনের ঝাল মিটিয়ে বালক কুটির থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, ফিরে এল গভীর রাতে।

পরদিন সকালে বালককে আর দেখা গেল না। বাসুদেব ও সিদ্ধার্থ যে রঙিন জামায় যাত্রীদের পারাপারের কড়ি সঞ্চয় করত সে জামাও গেছে অদৃশ্য হয়ে। নদীর ঘাটে এসে দেখে নৌকা নেই। নদীর ওপারে নৌকা বাঁধা আছে দেখা গেল। পুত্র পালিয়েছে।

আগের দিন ছেলের নির্মম কটূক্তি শোনার পর থেকে মর্মান্তিক বেদনায় মুহ্যমান হয়ে আছে সিদ্ধার্থ। তবু তার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিলম্ব হল না। সিদ্ধার্থ বলল, 'ওকে খুঁজে আনতে হবে। ওর মতো শিশু বনের মধ্যে দিয়ে একা যাবে কী করে? নিশ্চয়ই বিপদে পড়বে। বাসুদেব, এসো একটা ভেলা তৈরি করে আমরা ওপারে যাই।'

বাসুদেব বলল, 'হ্যাঁ, ভেলা তৈরি করতে হবে বৈকি! নৌকা তো আনতে হবে। কিন্তু বন্ধু, তোমার পুত্রকে যেতে দাও। সে তো আর শিশু নেই; নিজের ভার নেবার বয়স তার হয়েছে। সে নগরে ফেরার পথ সন্ধান করতে বেরিয়েছে—সে ঠিকই করেছে। এ-কথা তুমি ভুলে যেও না, এতদিন তুমি যা অবহেলা করেছ, বালক সেই কর্তব্য নিজেই পালন করবে। সে আজ নিজের ভার স্বহস্তে তুলে নিয়েছে, সে চলবে

নিজের পথে। সিদ্ধার্থ, আমি দেখতে পাচ্ছি কী নিদারুণ বেদনা তুমি ভোগ করছ; কিন্তু এ বেদনা তো হেসে উড়িয়ে দেওয়া উচিত; তুমি নিজেই দু-একদিনের মধ্যে আজকের বেদনার কথা মনে করে হেসে উঠবে।'

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল না। সে দা দিয়ে বাঁশ কেটে ভেলা তৈরি আরম্ভ করেছে; বেত ও ঘাসের দড়ি দিয়ে বাঁশ বাঁধতে সাহায্য করতে লাগল বাসুদেব। স্রোতের সাথে সংগ্রাম করে তারা দুজনে নদীর অপর পারে গিয়ে পৌঁছল।

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞাসা করল, 'দা সঙ্গে করে নিয়ে এলে কেন?'

বাসুদেব উত্তর দিল, 'দাঁড়টা হয়তো নেই।'

সিদ্ধার্থ বুঝতে পারল বাসুদেবের ইঙ্গিত। হয়তো ছেলে দাঁড় নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে গেছে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে এবং তাকে অনুসরণ করতে যেন না পারে সেজন্য দাঁড় ভেঙে ফেলেছে। তাদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত হল। নৌকায় দাঁড় নেই। বাসুদেব নৌকার তলার দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে হাসল; যেন বলতে চাইল : তোমার পুত্রের অভিপ্রায়টা বুঝতে পারছ? দেখছ না তার ইচ্ছা নয় আমরা অনুসরণ করি? কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। দা দিয়ে কাঠ কেটে নতুন দাঁড় তৈরি করতে আরম্ভ করল। সিদ্ধার্থ বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল পুত্রের খোঁজে। বাসুদেব বাধা দিল না।

অনেকক্ষণ বনে বনে ঘুরে সিদ্ধার্থের মনে হল বৃথা এই অনুসন্ধান। সে ভাবল, ছেলে হয়তো অনেক আগেই বন ছেড়ে নগরে পৌঁছে গেছে, অথবা এখনো যদি পথে থাকে তবু তার সন্ধান পাওয়া সহজ হবে না; কারণ তাকে দেখতে পেলেই ছেলে লুকিয়ে থাকবে। সিদ্ধার্থ নিজে মনে মনে ভাবল, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় সে আর ব্যাকুল নয়। কারণ তার দৃঢ় বিশ্বাস পথে পুত্র কোনো বিপদে পড়েনি, কিংবা পড়বার আশঙ্কাও নেই। তবু সিদ্ধার্থ ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল; পুত্রকে রক্ষা করতে নয়, হয়তো শুধু আর একবার দেখার জন্যই। ছেলেকে দেখার আকাঙ্ক্ষায় সিদ্ধার্থ বন পার হয়ে এসে পৌঁছল নগরের উপকণ্ঠে।

হঠাৎ একসময় খেয়াল হল সে দাঁড়িয়ে আছে কমলার প্রমোদ-উদ্যানের প্রবেশপথে। এখানে দাঁড়িয়েই সে একদিন কমলাকে দেখেছিল পালকি চড়ে উদ্যানে প্রবেশ করতে। অতীতের ছবি সিদ্ধার্থের চোখের সামনে ভেসে উঠল। সেই বড় বড় দাড়িগোঁফে ঢাকা মুখ, ধূলিমাখা রুক্ষ কেশ, উলঙ্গপ্রায় নবীন সন্ন্যাসীকে আবার সে দেখতে পেল চোখের সামনে। উন্মুক্ত প্রবেশপথের কাছে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল উদ্যানের সৌন্দর্য। দেখল, উদ্যানের সুন্দর গাছের ছায়ায় বৌদ্ধভিক্ষুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দীর্ঘকাল একভাবে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থ ভাবতে লাগল কত কথা; হারিয়ে যাওয়া অতীতের কত ছবি তার মনে জ্বলজ্বল হয়ে ভেসে উঠল; নিজের জীবনকাহিনীর আর একবার জীবন্ত অভিনয় দেখল। আজ যেখানে বৌদ্ধভিক্ষুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেই বড় গাছগুলির নিচে দেখতে পেল সিদ্ধার্থ ও কমলাকে। মানসপটে ফুটে উঠল কমলার প্রথম চুম্বনের দৃশ্য। কমলার প্রেমের পাঠ তাকে দাম্ভিক করে তুলেছিল, তার ঘৃণা জন্মেছিল সন্ন্যাসজীবনের ওপর। গর্ব ও ঔৎসুক্য নিয়ে সেদিন সিদ্ধার্থ প্রবেশ করেছিল

সংসারজীবনে। সিদ্ধার্থ আবার নতুন করে দেখতে পেল ভৃত্যবেষ্টিত কামস্বামীকে, তার উৎসব অনুষ্ঠান, পাশাখেলার আড্ডা এবং গানের আসরের ছবি ভেসে উঠল চোখের সামনে। সিদ্ধার্থ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে খাঁচায় বন্দি কমলার পোষা পাখিটা মধুর সুরে গান করছে। তার অতীত জীবনের পুনরাবৃত্তি হল। আর একবার সে সংসারজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করল; আবার সে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ হল, ক্লান্ত হল, জীবনের অভিজ্ঞতা মনে হল বিষময়; মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা জাগল মনে, আর সেই মুহূর্তে আর একবার শুনতে পেল পবিত্র 'ওম্'।

দীর্ঘক্ষণ উদ্যানের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকার পর সিদ্ধার্থ উপলব্ধি করল, যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে এখানে এসেছে তা নির্বোধ আকাঙ্ক্ষা। সে তার পুত্রকে সাহায্য করতে পারবে না, কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারে না; তার ইচ্ছা পুত্রের ওপর চাপিয়ে দেওয়াও সঙ্গত হবে না। পলাতক ছেলের প্রতি গভীর স্নেহ তাকে বন্দি করেছে; যন্ত্রণাক্লিষ্ট ক্ষতের মতো এই পুত্রস্নেহ তাকে সর্বদা বেদনা দেয়। অবশ্য সিদ্ধার্থ জানে এই ক্ষত একদিন শুকিয়ে যাবে, তার মধ্যে পচন সৃষ্টির সুযোগ পাবে না।

তবু এই মুহূর্তে ক্ষতটা শুকিয়ে যায়নি, তাই সিদ্ধার্থ বিষণ্ন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে পুত্রের পিছনে ছুটে এসেছে, আজ তার কোনো মূল্য নেই সিদ্ধার্থের কাছে; অন্তরে তার বিরাট শূন্যতা। বিষণ্নমনে সিদ্ধার্থ মাটিতে বসে পড়ল। সে অনুভব করল, কী যেন একটা মরে গেল তার হৃদয়ে। জীবনে তার আনন্দ নেই, নেই পথ চলার কোনো লক্ষ্য। সে বিষণ্নচিত্তে অপেক্ষা করতে লাগল। এমনি করে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে, কান পেতে শুনতে সিদ্ধার্থ শিখেছে নদীর কাছে। পথের ধুলার উপর বসে সে কান পেতে থাকল, শুনতে লাগল ক্লান্ত, ব্যথিত হৃদয়ের স্পন্দন। সে আশা করে আছে একটি সুর শোনার জন্য। কত প্রহর পার হয়ে গেল, সিদ্ধার্থ বসে আছে একভাবে। তার সকল স্বপ্ন গেছে হারিয়ে, ডুব দিয়েছে রিক্ততার সমুদ্রে। শূন্যতার গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসার পথ চোখে পড়ে না। বেদনা যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন মৃদুস্বরে সিদ্ধার্থ উচ্চারণ করল 'ওম্'; 'ওম্' দিয়ে পূর্ণ করল নিজেকে। উদ্যানের ভিক্ষুরা লক্ষ করল একটি লোক বহুক্ষণ ধরে এককভাবে বসে আছে, পথের ধুলায় তার শাদা চুল ঢেকে যাচ্ছে; একজন ভিক্ষু এগিয়ে এসে তার সামনে দুটো পাকা কলা রেখে গেল। সিদ্ধার্থ তা দেখতে পেল না।

কাঁধের উপরে হাতের স্পর্শ অনুভব করে সিদ্ধার্থের ধ্যান ভেঙে গেল; সেই ভীরু, মৃদু স্পর্শটি চিনতে দেরি হল না। সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাল বাসুদেবকে। বাসুদেবের মমতাভরা মুখ, হাস্যোচ্ছল বলিরেখা এবং দীপ্ত চোখের দিকে চেয়ে তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। এবার দেখতে পেল পায়ের কাছে দুটো পাকা কলা পড়ে আছে। কলাদুটো তুলে নিয়ে একটা দিল বাসুদেবকে আর একটা নিজে খেল। আবার দুজনে বনের পথ পার হয়ে পৌঁছল খেয়াঘাটে। কী ঘটেছে তার উল্লেখ কেউ করল না, ছেলের নাম কেউ মুখে আনল না, বলল না তার পালিয়ে যাবার কথা, কী গভীর বেদনা পেয়েছে সিদ্ধার্থ তার আলোচনাও করল না তারা। কুটিরে পৌঁছে সিদ্ধার্থ বিছানায় শুয়ে পড়ল; একটু পরে বাসুদেব যখন তার জন্য একগ্লাস ডাবের পানি নিয়ে এল তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সিদ্ধি লাভ

দীর্ঘদিন পার হয়ে গেল; তবু আঘাতের তীব্র জ্বালাটা দূর হল না। সিদ্ধার্থ প্রতিদিন কত যাত্রী পার করে দেয়; তাদের অনেকের সঙ্গে থাকে পুত্র কিংবা কন্যা। পুত্র-কন্যাসহ যাত্রীদের দেখে সে ঈর্ষা রোধ করতে পারে না; মনে মনে ভাবে : এতলোকের ভাগ্যে এমন মহৎ আনন্দ আছে—আমার কেন নেই? যারা শয়তান, যারা চোর, যারা দস্যু, তাদেরও সন্তান আছে; ছেলেমেয়েদের তারা ভালোবাসে এবং প্রতিদানে সন্তানদের কাছ থেকে পায় ভালোবাসা। শুধু সিদ্ধার্থ এই সুখ থেকে বঞ্চিত। আজকাল এমনি শিশুসুলভ যুক্তিহীন কথা নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করে। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের কত কাছাকাছি সে নেমে এসেছে! এখন সে সংসারের লোকদের নতুন চোখে দেখতে শিখেছে; আগের মতো বুদ্ধির অহঙ্কার নেই; সাধ নেই; তাই আজকের দেখায় আছে আন্তরিকতা, কৌতূহল ও সহানুভূতি।

ব্যবসায়ী, সৈন্য, নারী—এমনি কত বিভিন্ন ধরনের লোককে সিদ্ধার্থ প্রত্যহ পার করে দেয়। একদিন এদের অচেনা মনে হত, যেন এদের সঙ্গে তার যোগ নেই; কিন্তু আজ আর তা মনে হয় না। তাদের মতামত সে এখনো গ্রহণ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু গ্রহণ করেছে তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের জীবনের উদ্দীপনা। যদিও সিদ্ধার্থ আত্মসংযমের উচ্চস্তরে পৌঁছেছে, যদিও সে তার সর্বশেষ আঘাত নীরবে সয়েছে, তবু আজ সে অনুভব করছে জনসাধারণ তার ভাই। তাদের গর্ব, আকাঙ্ক্ষা ও তুচ্ছতা এখন আর অসম্ভব মনে হয় না তার কাছে। এখন এই সাধারণ মানুষগুলোকে যেন হঠাৎ বুঝতে পারা যাচ্ছে, তারা ভালোবাসার পাত্র হবার যোগ্যতা লাভ করেছে; এমনকি এখন তাদের শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করতেও দ্বিধা নেই সিদ্ধার্থের। সন্তানের জন্য মাতার অন্ধ ভালোবাসা, একমাত্র পুত্রের জন্য স্নেহান্ধ পিতার হাস্যকর অহঙ্কার, তরুণীর অলঙ্কারের কামনা এবং পুরুষের প্রশংসালাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টা—এসব সিদ্ধার্থ এখন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখেছে। এসব সাধারণ, হাস্যকর কিন্তু অত্যন্ত প্রবল এবং জৈব প্রেরণা ও আকাঙ্ক্ষা সিদ্ধার্থের কাছে আর তুচ্ছ নয়। এরাই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা দেয়, মহৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে, গৃহকোণ ছেড়ে দেশ-দেশান্তরের পথে বেরিয়ে পড়ার ইশারা দেয়; এই কামনা-বাসনার জন্যই মানুষ যুদ্ধ করে, কত গভীর দুঃখ সহ্য করে। এজন্যই আজ সিদ্ধার্থ সংসারের সাধারণ লোকদের ভালোবাসে। একদিন যাদের সংসারাসক্ত বলে অবজ্ঞা করেছে, তাদের সকল আকাঙ্ক্ষা অভাববোধের মধ্যে সিদ্ধার্থ দেখেছে জীবনকে, দেখেছে জীবনীশক্তির সতেজ দীপ্তি; আর দেখতে পেয়েছে অবিনশ্বর পরম ব্রহ্মের বিকাশ। শুধু একটি ছোট জিনিস দেখতে পায়নি এদের মধ্যে, একটিমাত্র অতিশয় ক্ষুদ্র জিনিস, এদের মধ্যে ঋষি ও ধ্যানীর সকল গুণই আছে; নেই শুধু সৃষ্টির ও সকল জীবনের মধ্যে ঐক্যবোধের জ্ঞান। কিন্তু অনেক সময় সিদ্ধার্থের আবার সংশয় জেগেছে : এই জ্ঞান, এই চিন্তার মূল্য কি সত্যি এত বেশি? এই অভাবের ওপর জোর দিয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কি ছেলেমানুষের মতো নিজেদেরই চাটুবাদ করছে না? কে জানে, যারা জ্ঞানী তারা হয়তো চিন্তার ক্ষমতাসম্পন্ন শিশু ছাড়া আর কিছু নন। অন্যসব দিক থেকে সংসারের

সাধারণ লোকেরা চিন্তাবিদদের সমকক্ষ এবং অনেক ক্ষেত্রে হয়তো-বা শ্রেষ্ঠ—যেমন বনের পশুরা সেসব কাজে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ যেসব কাজ একাগ্র অধ্যবসায় নিয়ে তারা করে যায়। প্রয়োজনের তাগিদে পশুর মনে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে হিংস্র একগুঁয়েমি জেগে ওঠে, মানুষের মাঝে কদাচিৎ তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে সিদ্ধার্থ আপন মনে উপলব্ধি করল প্রকৃত জ্ঞানের স্বরূপ। ক্রমে এই উপলব্ধি পূর্ণতা লাভ করে তার মধ্যে। এতদিনে সে বুঝতে পেরেছে কী খুঁজে খুঁজে জীবনের দীর্ঘ পথ সে চলেছে; আজ স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে জীবনব্যাপী অন্বেষণের লক্ষ্য। সে আর কিছু নয়; শুধু আত্মার প্রস্তুতি। জীবনের প্রতি মুহূর্তে ঐক্যবোধের গূঢ় অনুভূতি তার মধ্যে ধীরে ধীরে পূর্ণতা লাভ করেছে—যেমন করেছে বাসুদেবের মধ্যে। অন্তরের এই অনুভূতির ফলে বাসুদেবের শিশুর মতো সরল ও পবিত্র মুখমণ্ডলে ফুটে উঠেছে সৃষ্টির চিরপূর্ণতা, সংগতি ও ঐক্যবোধের দীপ্তি।

কিন্তু সেই ক্ষতের জ্বালা এখনো শেষ হয়নি। ছেলের কথা মনে পড়লে এখনো তার ব্যথাক্লিষ্ট হৃদয় ব্যগ্র হয়ে ওঠে, পুত্রের জন্য এখনো সে মনের এককোণে সকরুণ প্রীতি লালন করে। ভালোবাসার সকল নির্বুদ্ধিতার স্তরগুলো সে পার হয়েছে, এখন আছে শুধু ভালোবাসার বেদনা—যে বেদনার অদৃশ্য যাতনা দিনের পর দিন গভীরতর হয় তার হৃদয়ে। ছেলে যে ভালোবাসার শিক্ষা জ্বালিয়ে গেছে, সে শিক্ষা আজও জ্বলছে অম্লান জ্যোতিতে।

একদিন পুরাতন ক্ষতের বেদনা তীব্র হয়ে উঠলে গভীর আকাঙ্ক্ষায় অভিভূত হয়ে সিদ্ধার্থ নদীর ওপারে গেল; শহরে গিয়ে পুত্রকে খুঁজে বের করবে- এই উদ্দেশ্য নিয়ে নৌকা থেকে সিদ্ধার্থ তীরে নামল। তখন গ্রীষ্মকাল, নদীর উচ্ছলতা নেই; শান্ত নদী ধীরে ধীরে বয়ে চলেছে। তবু হঠাৎ নদীর বুক থেকে আশ্চর্য শব্দ ভেসে এল; নদী হাসছে, স্পষ্ট শোনা গেল সেই হাসি। বৃদ্ধ পাটনীর দিকে চেয়ে চেয়ে নদী যেন সানন্দে খিলখিল করে হাসছে। সিদ্ধার্থ থমকে দাঁড়াল; মাথা নিচু করে পানির উপর কান পেতে রাখল ভালো করে শোনার জন্য। সেই মন্থর গতিসম্পন্ন স্বচ্ছ জলের পানিতে সিদ্ধার্থ তার মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল; বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে তার হঠাৎ মনে পড়ে গেল এমনি আর একটি মুখ; আজকের প্রতিবিম্বিত মুখের সাথে যার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। সে মুখ যাঁর, তাঁকে এতদিন ভুলে ছিল সিদ্ধার্থ। আজ চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই মুখের মালিককে, তার ব্রাহ্মণ পিতাকে। পিতার সাথে ছিল তার গভীর অন্তরঙ্গতা, সে ভালোবাসত তাঁকে, হয়তো-বা ভয়ও করত। আজ মনে পড়ল যৌবনে একদিন কেমন করে পিতাকে বাধ্য করেছিল সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিতে, কেমন করে বিদায় নিয়েছিল। সেই ছিল শেষ বিদায়, আর কখনো সিদ্ধার্থ গৃহে ফেরেনি। আজ ছেলের জন্য সিদ্ধার্থ যে বেদনা বোধ করছে, সে বেদনা কি পিতাকেও ভোগ করতে হয়নি তার জন্য? ছেলেকে আর একবারও না-দেখেই তো দীর্ঘকাল পূর্বে নিঃসঙ্গ পিতা পরলোকগমন করেছেন। সিদ্ধার্থও কি ঠিক সেই পরিণতি আশা করবে না? সৃষ্টির অন্ধ ভাগ্যচক্রে ঘুরছে; ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়; কী বিচিত্র এই প্রহসন!

নদী হাসছে। হ্যাঁ, তাই হয়। দুঃখ চক্রাকারে ঘুরে আসে। যে দুঃখ ভোগ করা হয়নি

প্রথম জীবনে, তা হয়তো দেখা দেবে জীবনের শেষে। এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সিদ্ধার্থ আবার নৌকায় উঠল, ফিরে এল কুটিরের ঘাটে। একবার মনে পড়ছে পিতার কথা, একবার ছেলের কথা; আবার মনে পড়ছে, নদী হেসে যেন তাকে বিদ্রূপ করছে। সিদ্ধার্থের অন্তরে জেগেছে দ্বন্দ্ব, পড়েছে হতাশার ছায়া; নিজেকে, সমগ্র সংসারকে হেসে বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা হয়। হৃদয়ের ক্ষতটা এখনো মিলিয়ে যায়নি, ভাগ্যের বিরুদ্ধে তার মন এখনো বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। দুঃখকে জয় করতে পারেনি এখনো, ফিরে পায়নি অন্তরের প্রশান্তি। তবু আজ এই মুহূর্তে, তার মনে সাহস আসে সে দুঃখ জয় করতে পারবে। বাসুদেবের কাছে সবকিছু স্বীকার করার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় মন পূর্ণ হয়ে উঠেছে তার। যে লোকটি অন্যের কথা নীরবে ধৈর্যসহকারে শোনার কৌশল আয়ত্ত করেছে, তার কাছে সিদ্ধার্থ কিছুই গোপন করবে না—সব খুলে বলবে।

বাসুদেব কুটিরে বসে বসে ঝুড়ি তৈরি করছে। এখন সে আর খেয়ানৌকায় কাজ করে না। তার চোখের দৃষ্টি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, হাত ও বাহু ধীরে ধীরে শক্তিহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মুখমণ্ডলে আনন্দ ও প্রশান্তির দীপ্তি এখনো ম্লান হয়নি।

সিদ্ধার্থ বৃদ্ধের পাশে বসে বলল তার কথা। যেসব কথা কোনোদিন বলেনি, আজ সিদ্ধার্থ তা বলল। মনের জ্বালায় অস্থির হয়ে কেমন করে সেবার নগরে গিয়েছিল, ভাগ্যবান পিতাদের দেখে কীভাবে মনে ঈর্ষা জেগেছিল, কেমন করে নিজের নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিল, কীভাবে অন্তরের প্রচণ্ড দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল—একে একে সব সে বলল। বাসুদেবকে সব বলা যায়, চরম বেদনার অনুভূতিও তার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না। তার অন্তরের রক্তস্রাবী গোপন ক্ষতটা তুলে ধরল বাসুদেবের সামনে; নগরে পুত্রের সন্ধানে যাবার জন্য আজ যে নদী পার হয়ে ওপারে গিয়েছিল, তারপর নদী তার বোকামিতে হেসে ওঠায় আবার সে যে ফিরে এসেছে—সেইসব কথাও বাসুদেবকে খুলে বলল।

বাসুদেব প্রশান্তমুখে শুনছে সিদ্ধার্থের কথা। বাসুদেবের এমন গভীর মনোযোগ সিদ্ধার্থ আগে আর কখনো দেখেনি। সিদ্ধার্থ অনুভব করছে তার সব দুঃখ-যাতনা, তার সকল দুশ্চিন্তা এবং যত গোপন আকাঙ্ক্ষা—সব স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে বাসুদেবের কাছে, এবং আবার ফিরে আসছে তার ভেতরে। নদীতে গোসল করলে যেমন দেহ শীতল হয়, নদীর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করা যায়, তেমনি বাসুদেবের মতো শ্রোতার কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করলে ক্ষতের জ্বালা শান্ত হয়, শ্রোতার সঙ্গে একাত্মতাবোধের অনুভূতি জাগে। নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করতে করতে সিদ্ধার্থের মনে হল তার শ্রোতা চিরপরিচিত বাসুদেব যেন কোনো সাধারণ মানুষ নয়। গাছ যেমন বৃষ্টির পানি শোষণ করে তেমনি এই নিশ্চল নিস্তব্ধ মূর্তিটি শোষণ করেছে তার প্রত্যেকটি কথা। হঠাৎ সিদ্ধার্থের মনে হল এই স্থির মূর্তিটি বাসুদেবের নয়; বাসুদেব আর নেই, সিদ্ধার্থ স্থিরমূর্তির মাঝে দেখছে নদীকে, শাশ্বত মহাকালকে, স্বয়ং ভগবানকে। বাসুদেবের মধ্যে এই পরিবর্তন তাকে অভিভূত করল। কিন্তু যতই সে বাসুদেবের পরিবর্তনকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল ততই অনুভব করল এই পরিবর্তন দেখে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বহুদিন থেকে, হয়তো-বা চিরদিন, বাসুদেব এমনি ছিল, তার বাহ্য রূপের

পশ্চাতে ছিল আর একটি রূপ; আজ বাসুদেবের মধ্যে যে নতুন রূপ দেখে সে বিস্মিত হয়েছে, তা আছে বহুদিন থেকে; শুধু সিদ্ধার্থ দেখতে পায়নি, তার দেখার সে দৃষ্টি ছিল না বলে। লোকে দেবতাদের যেমন শ্রদ্ধা করে, সিদ্ধার্থের মনেও এই মুহূর্তে বাসুদেবের প্রতি সে শ্রদ্ধা জেগেছে। কিন্তু এ শ্রদ্ধা স্থায়ী হবে না সে-কথাও জানে সিদ্ধার্থ। সে মনে মনে বিদায় নিল বাসুদেবের কাছ থেকে; কিন্তু তার কথা বন্ধ হল না।

সিদ্ধার্থের কথা শেষ হল; বাসুদেব তার ক্ষীণ দৃষ্টি রাখল সিদ্ধার্থের মুখের ওপর। বাসুদেব একটি কথাও বলল না, কিন্তু তার মৌন মুখমণ্ডল থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল প্রেম ও প্রশান্তি, জ্ঞান ও সহানুভূতি। বাসুদেব নীরবে সিদ্ধার্থের হাত ধরে তাকে নিয়ে এল নদীর তীরে, একটা আসনের উপর দুজনে পাশাপাশি বসল; নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে বাসুদেবের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল।

বাসুদেব বলল, 'তুমি নদীর হাসি শুনেছ, কিন্তু তার সব কথা শোননি। কান পেতে থাকো, আরো কত কথা শুনতে পাবে।

দুজনে কান পেতে রইল। নদীর বহুস্বরের মিলিত সঙ্গীত ভেসে আসছে। সিদ্ধার্থ নদীর দিকে চেয়ে প্রবহমান জলধারার মাঝে দেখতে পেল কত ছবি। সে দেখতে পেল তার পিতাকে—নিঃসঙ্গ পুত্রশোকে কাতর, ঠিক তেমনি দেখল নিজের ছবি; দূরগামী পুত্রের জন্য স্নেহে ব্যাকুল হয়ে সিদ্ধার্থ একাকী পথ চলছে। আর একটি ছবি ভেসে উঠল; দেখল, তার পুত্র একাকী ব্যগ্র হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কামনাতপ্ত পথে। প্রত্যেকে আপন লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না, তাই সবাই দুঃখ ভোগ করছে।

বাসুদেব তার নীরব দৃষ্টি দিয়ে প্রশ্ন করল, 'শুনতে পাচ্ছ?' সিদ্ধার্থ মাথা নেড়ে জানাল সে শুনতে পাচ্ছে।

'আরো ভালো করে শোনো!' চুপি চুপি বলল বাসুদেব।

সিদ্ধার্থ আরো গভীরভাবে শুনতে চেষ্টা করল। বাবার ছবি, তার নিজের ছবি, পুত্রের ছবি—সব একাকার হয়ে গেল। একবার কমলার ছবি ফুটে উঠল, আবার ভেসে চলে গেল নদীর পানির সঙ্গে। গোবিন্দের ছবি, আরো কত লোকের ছবি ভেসে এল, আবার বয়ে চলে গেল। তারা প্রত্যেকে আজ নদীর অংশ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকের লক্ষ্য ছিল এই নদী; তারা কামনা, বাসনা ও বেদনা নিয়ে এসেছে এই নদীর স্রোতপ্রবাহে, তাই নদীর স্বরও কত অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, গভীর দুঃখে পূর্ণ। নদী বয়ে চলেছে তার গন্তব্যের দিকে। সিদ্ধার্থ আজ উপলব্ধি করল এই চিরপ্রবহমান নদী তাকে দিয়ে, তার আত্মীয়স্বজন এবং সকল পরিচিত ব্যক্তিদের দিয়ে তৈরি। নদীর প্রতিটি ঢেউ, প্রতিটি জলকণা দুঃখময় দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ছুটে চলেছে লক্ষ্যের দিকে; আর সে লক্ষ্য তো একটি নয়, কত লক্ষ্য : জলপ্রবাহ, মহাসাগর। পানি বাষ্প হয়, মেঘ হয়ে উপরে ওঠে, নেমে আসে বৃষ্টি হয়ে; বৃষ্টির জল ঝরনা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে পাহাড়ের বুক বেয়ে নেমে আসে, সৃষ্টি হয় নদী। এমনি করেই নদী নিত্যনতুন রূপ গ্রহণ করছে, অখণ্ড গতিশীলতা তাকে দিয়েছে অক্ষত যৌবন। নদীর স্বরে যে ব্যাকুলতা ছিল তা যেন বদলে গেল। এখনো তার স্বরে আছে বেদনার রেশ, তবু অন্য অনেক নতুন সুর মিলেছে তার সঙ্গে—আনন্দ ও বেদনা, মঙ্গল ও অমঙ্গল, হাসি ও

কান্নার সুর মিশে গেছে; কত শত সহস্র সুর নদীর স্বরের মধ্যে এক হয়ে গেছে।

সিদ্ধার্থ কান পেতে শুনছে নিবিষ্ট চিত্তে, সম্পূর্ণ মগ্ন হয়ে, সম্পূর্ণ শূন্য মনে, সবকিছু অন্তরে টেনে নিয়ে। এখন তার মনে হল সে সম্পূর্ণরূপে শিখেছে শোনার কৌশল। নদীর সুরের মধ্যে অসংখ্য সুর সে আগেও শুনেছে, কিন্তু আজকের শোনাটা নতুন। আজ সে আর বিভিন্ন সুরের মধ্যে পার্থক্য করতে পারল না; আনন্দের সুর থেকে কান্নার স্বরকে, শিশুর সুর থেকে বয়স্কের স্বরকে আলাদা করা যায় না। সব মিলে প্রার্থীর দীর্ঘশ্বাস, বিজ্ঞের হাসি, মুমূর্ষুর আর্তনাদ সব এক হয়ে গেছে নদীর সুরে। সকল সুর, সকল লক্ষ্য, সকল কামনা, সকল বেদনা, সকল আনন্দ, সকল মঙ্গল ও অমঙ্গল নিয়েই তো এই সংসার। এদের সবাইকে নিয়ে ঘটনাপ্রবাহ, এরা সবাই মিলে রচনা করেছে জীবনের সঙ্গীত। সিদ্ধার্থ হাসি ও কান্নার সুরকে আলাদা করে শুনছে না; যখন সে নদীর মধ্যে শুনছে সহস্র স্বরের মিলিত ধ্বনি, তখন সেই হাজারো স্বরের মিলিত সংগীতে থাকে শুধু একটি কথা: 'ওম্'—পূর্ণতা।

'শুনেছ?'—বাসুদেব আবার প্রশ্ন করল তার নীরব দৃষ্টি দিয়ে।

বাসুদেবের মুখে উজ্জ্বল হাসি। নদীর হাজারো সুর ছাপিয়ে যেমন শোনা যায় 'ওম্'-ধ্বনি, তেমনি বাসুদেবের কুঞ্চিত মুখের বলিরেখার উপর ছড়িয়ে আছে একটি উজ্জ্বল, প্রশান্ত হাসির রেখা। বাসুদেবের মুখের সেই অপূর্ব হাসি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল সিদ্ধার্থের মুখে। তার ক্ষত শুকিয়ে গেছে, বেদনা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে; সৃষ্টির অখণ্ড ঐক্যের মধ্যে ডুবে গেছে সিদ্ধার্থের ব্যক্তিসত্তা।

সেই মুহূর্ত থেকে ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বন্ধ করল সিদ্ধার্থ। জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তি ফুটে উঠেছে তার মুখে। কামনাকে যে জয় করেছে, যে মুক্তিলাভ করেছে, বিশ্বের জীবনধারার সঙ্গে যে নিজের জীবনের সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে, যার অন্তর সহানুভূতি ও করুণায় পূর্ণ, জীবনের স্রোতে যে আত্মসমর্পণ করে সৃষ্টির ঐক্যানুভূতির মধ্যে ডুব দিয়েছে; শুধু তার মুখেই এমন দীপ্তি সম্ভব।

বাসুদেব উঠে দাঁড়াল। সিদ্ধার্থের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল তার দুই চোখ জ্ঞানের প্রশান্ত দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থের কাঁধ আশীর্বাদের ভঙ্গিতে স্পর্শ করে স্নেহকোমল কণ্ঠে বাসুদেব বলল, 'এই শুভ মুহূর্তটির জন্যই আমি অপেক্ষা করে ছিলাম, বন্ধু। সেই শুভক্ষণ এসেছে, এখন আমি বিদায় নেব। বাসুদেব হয়ে অনেকদিন কাটিয়েছি মাঝির কাজে। সে জীবন আজ শেষ হল। সিদ্ধার্থ, তোমার কাছ থেকে, আমার কুটিরের কাছ থেকে এবং এই প্রিয় নদীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।'

সিদ্ধার্থ নত হয়ে প্রণাম করল বাসুদেবকে।

'আমি জানতাম' মৃদুস্বরে বলল সিদ্ধার্থ।

'তুমি কি বনে যাবে?'

'হ্যাঁ, বনে যাচ্ছি। আমি যাচ্ছি সৃষ্টির ঐক্যপ্রবাহে ডুবে যেতে।' দীপ্তকণ্ঠে বলল বাসুদেব।

বাসুদেব চলে গেল। সিদ্ধার্থ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার পথের দিকে। সিদ্ধার্থ গভীর আনন্দ ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে দেখছে বাসুদেবের ধীরে ধীরে দূরে চলে যাওয়া। প্রতি পদক্ষেপে কী শান্তি, মুখে কী দীপ্তি, সমগ্র দেহে কী আলোর বিচ্ছুরণ!

গোবিন্দ

কমলা তার উদ্যান বুদ্ধের শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য দান করেছে। একবার অন্য ভিক্ষুদের সঙ্গে কিছুদিন গোবিন্দ বিশ্রাম করেছিল সেই উদ্যানে। সেখানে থাকতে থাকতে সে শুনতে পেয়েছে নদীতীরের বৃদ্ধমাঝির কথা। কমলার উদ্যান থেকে খেয়াঘাট একদিনের পথ। অনেকে তাকে বিশেষ জ্ঞানী বলে শ্রদ্ধা করে। গোবিন্দ ব্যগ্র হল, দেখতে হবে সেই মাঝিকে। বিশ্রামের সময় পার হবার পর সে বেরিয়ে পড়ল খেয়াঘাটের দিকে। যদিও গোবিন্দ সংঘের নিয়ম মেনে চলেছে এবং তরুণ ভিক্ষুরা তাকে শ্রদ্ধা করে, তবু তার হৃদয়ের অস্থিরতা শান্ত হয়নি, তার খোঁজা পরিতৃপ্ত হয়নি।

নদীর ঘাটে পৌঁছে গোবিন্দ বৃদ্ধমাঝিকে বলল নদী পার করে দিতে। ওপারে পৌঁছে গোবিন্দ মাঝিকে বলল, 'ভিক্ষু ও তীর্থযাত্রীদের প্রতি তোমার সহানুভূতির শেষ নেই। তুমি আমাদের অনেককে পার করে দিয়েছ। আমাদের মতো তুমিও কি ঠিক পথ খুঁজে বেড়াচ্ছ না?'

সিদ্ধার্থের ক্ষীণ চোখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, 'হে পূজনীয় শ্রমণ, তুমি বৃদ্ধ হয়েছ, পরেছ গৌতম-শিষ্যের গেরুয়া পোশাক তবু এখনো কি তুমি শুধুই খুঁজে বেড়াচ্ছ?'

'সত্যি বৃদ্ধ হয়েছি', গোবিন্দ বলল, 'কিন্তু খোঁজার শেষ হয়নি, কখনো হবেও না। শুধু খোঁজাটাই বুঝি, আমার মনে হয় তুমিও দীর্ঘকাল পথের সন্ধানে ঘুরেছ। তোমার অভিজ্ঞতা আমাকে একটু বলবে, বন্ধু?'

সিদ্ধার্থ বলল, 'তোমার উপকার হবে এমন কী কথা বলব? শুধু বলতে পারি যে, তুমি বোধহয় বড়বেশি খুঁজিয়ে; আর সেই খোঁজার ধান্দায় হারিয়ে ফেলেছ পথের লক্ষ্যস্থল। তাই জীবনের শেষ হয়ে এল, কিন্তু পেলে না কিছুই।'

'এমন কেন হয়?' গোবিন্দ জানতে চাইল।

সিদ্ধার্থ বলল, 'এ তো খুব খুব স্বাভাবিক যে, তুমি খুঁজতে বেরিয়ে যে জিনিসটি খুঁজছ শুধু তা দেখবার জন্যই উৎসুক হয়ে থাকবে। অন্যকিছু দেখতে পাবে না, অন্যকিছু অন্তরে গ্রহণ করতে পারবে না; কারণ তোমার সামনে আছে একটা লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য তোমাকে অন্ধ করেছে। খোঁজার অর্থ : মুক্ত হওয়া, উন্মুক্ত অন্তরে সবকিছু গ্রহণ করা, নির্দিষ্ট লক্ষ্য না-রাখা। তুমি হয়তো প্রকৃতই একজন সন্ধানী, তাই চোখের নিচে যেসব জিনিস রয়েছে তাদেরও দেখতে পাও না।'

'ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা', গোবিন্দ বলল, 'কী বলতে চাইছ?'

সিদ্ধার্থ বলল, 'একবার, অনেক বছর আগে, তুমি এই নদীর তীরে এসে একটি লোককে ঘুমাতে দেখেছিলে। ঘুমন্ত লোকটির পাশে বসে তুমি পাহারা দিয়েছ, কিন্তু গোবিন্দ, তুমি তাকে চিনতে পারনি।'

বিস্মিত হয়ে ভিক্ষু তাকাল মাঝির দিকে।

দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'তুমি সিদ্ধার্থ? এবারেও তোমাকে চিনতে পারিনি। আবার তোমার দেখা পেয়ে খুবই খুশি হলাম। তুমি অনেক বদলে গেছ, বন্ধু। এখন কি তুমি খেয়াঘাটের মাঝির কাজ করছ?'

প্রাণ খুলে হেসে উঠল সিদ্ধার্থ। 'হ্যাঁ, আমি মাঝি হয়েছি। বহু লোক আছে যারা বদলায়, নানা বেশ ধরে; বন্ধু, আমি তাদেরই একজন। গোবিন্দ, আজকের রাতটা তুমি আমার কুটিরে থেকে যাও। এসো, তোমাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

সিদ্ধার্থের কুটিরে গোবিন্দের সেই রাতটা কাটল। ঘুমাল বাসুদেবের বিছানায়। যৌবনের বন্ধুকে সে প্রশ্ন করে অনেক কথা জেনে নিল তার জীবন সম্পর্কে।

পরদিন সকালে বিদায় নেবার সময় একটু দ্বিধার সাথে গোবিন্দ বলল, 'সিদ্ধার্থ, যাবার আগে তোমাকে আর একটি প্রশ্ন করতে চাই। তোমার কি এমন কোনো মতবাদ, বিশ্বাস অথবা জ্ঞানের ওপর আস্থা আছে, যে আস্থা তোমাকে বাঁচতে সাহায্য করে, সাহায্য করে ন্যায়পথে চলতে?'

সিদ্ধার্থ বলল, 'বন্ধু, তুমি তো জানো, যৌবনে যখন সন্ন্যাসীদের সাথে বনে বাস করতাম তখন থেকেই গুরু ও শিক্ষার ওপর আস্থা হারিয়েছি, গুরু ও তাঁদের মতবাদ পেছনে ফেলে এগিয়ে এসেছি নতুন পথে। যদিও এরপর থেকে অনেক গুরুর দেখা পেয়েছি, তবু আমার সেদিনের মত বদলায়নি। একটি সুন্দরী গণিকা আমার গুরু ছিল অনেকদিন, একজন ধনী ব্যবসায়ী এবং পাশা খেলোয়াড়কেও পেয়েছিলাম শিক্ষক হিসেবে। একদিন বনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম; একজন বৌদ্ধভিক্ষু তার তীর্থযাত্রা স্থগিত রেখে পাশে বসে আমাকে পাহারা দিয়েছিল। তার কাছ থেকেও আমি শিক্ষালাভ করেছি, তার দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এই নদী ও বাসুদেব আমাকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা দিয়েছে। বাসুদেব ছিল সাধারণ লোক, চিন্তাশীল দার্শনিক সে ছিল না; কিন্তু গৌতমের মতো অতি সহজভাবে সকল জিনিসের মূলতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারত। বাসুদেব পুণ্যাত্মা, বাসুদেব মহাপুরুষ।'

গোবিন্দ : 'সিদ্ধার্থ, আমার মনে হয় তুমি এখনো একটু তামাশা করতে ভালোবাস। আমি বিশ্বাস করি তুমি কোনো গুরুর উপদেশই মেনে চলনি; কিন্তু তোমার নিজস্ব কোনো মতবাদ না থাকলেও জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে তোমার কি বিশেষ কতকগুলো চিন্তা ও ধারণা নেই? এমন কোনো জ্ঞান কি তুমি পাওনি যা তোমাকে সুস্থ জীবনযাপনে সাহায্য করেছে? যে জ্ঞান তুমি লাভ করেছ সে সম্বন্ধে আমাকে যদি কিছু বলো তাহলে খুব খুশি হব।'

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, অনেক সময় নতুন ভাবনা এসেছে আমার মনে, হয়তো উপলব্ধি করেছি নতুন কোনো জ্ঞান; কিন্তু আজ সব কথা তোমাকে বুঝিয়ে বলা কঠিন হবে। গোবিন্দ, যে-কথাটি সবচেয়ে গভীর ছাপ দিয়েছে আমার মনে তা হল এই : জ্ঞান কাউকে শেখানো যায় না, দেওয়া যায় না। জ্ঞানী লোক যখন জ্ঞান বিতরণের চেষ্টা করেন তখন সে চেষ্টা আমার কাছে নির্বুদ্ধিতা বলে মনে হয়।'

'তুমি কি উপহাস করছ?' গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল।

'না, পরিহাস নয়। সারাজীবন খুঁজে যা আবিষ্কার করেছি, তোমাকে তাই বলেছি। বিদ্যা অন্যকে দেওয়া যায়, জ্ঞান দেওয়া যায় না। জ্ঞান নিজের সাধনার দ্বারা লাভ করতে হয়; যিনি জ্ঞানলাভ করেছেন তাঁর জীবন পূর্ণ হলেও এবং জ্ঞানের সাহায্যে বিস্ময় সৃষ্টি করতে পারলেও সে জ্ঞান কাউকে দান করতে পারবেন না। যোগ্যতম

শিষ্যকেও শিখিয়ে দেওয়া যায় না জ্ঞানের রহস্য। যৌবনেই এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ ছিল, তাই গুরুর শিক্ষা ত্যাগ করে চলে এসেছিলাম। গোবিন্দ, প্রত্যেক সত্যের বিপরীতটাও সমান সত্য—হয়তো এ-কথা তুমি পরিহাস অথবা আমার নির্বুদ্ধিতা বলে মনে করবে। কিন্তু আমার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই এ-কথা বলছি। একমাত্র আংশিক সত্যকেই কথায় প্রকাশ করা যায়। যা-কিছু আমরা চিন্তা করি বা কথায় প্রকাশ করি তা সত্যের একাংশ মাত্র; সত্যকে প্রকাশ করলেই তার সমগ্রতা, পূর্ণতা এবং ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়। বুদ্ধ যখন উপদেশ দিয়েছেন শিষ্যদের, তখন তিনি জগৎকে ভাগ করে নিয়েছেন সংসার ও নির্বাণ, মায়া ও সত্য এবং দুঃখ ও মুক্তির মধ্যে। এ ছাড়া উপায় নেই; যাঁরা দিতে চান তাঁদের এ পথই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু যে জগতে আমরা বাস করি, যে জগৎ আমাদের চারদিক থেকে বেষ্টন করে আছে তা তো খণ্ডিত নয়। কোনো লোক বা কোনো কাজই সম্পূর্ণরূপে সংসার বা নির্বাণ নয়; সম্পূর্ণরূপে সাধু কিংবা পাপী কেউ নয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সত্য—এই ভ্রান্ত ধারণার ফলেই আমরা ভুল করি। গোবিন্দ, সময়ের এই বিভাগ প্রকৃত নয়; বারবার এ সত্য উপলব্ধি করেছি। সময় যদি সত্য না হয়, তাহলে বর্তমান জগৎ ও অনন্ত জগতের ব্যবধান, আনন্দ ও বেদনা, মঙ্গল ও অমঙ্গলের পার্থক্যও মিথ্যা মায়া।'

গোবিন্দ সিদ্ধার্থের কথা বুঝতে না-পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'সে কী রকম?'

'শোনো, বন্ধু! তুমি পাপী, আমি পাপী; কিন্তু একদিন আমরা নির্বাণ লাভ করব, বুদ্ধত্ব লাভ করব, এই ভরসায় আছি! অথচ এই 'একদিন' শুধুই মায়া। আজকের সাথে ভবিষ্যতের একটি অনিশ্চিত দিনের তুলনা করে একটু সান্ত্বনা পাওয়া ছাড়া আর কিছুই নেই। পাপী বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পথে যাত্রা করেনি; মানুষের জীবন তো বিবর্তনের নিয়ম মেনে একটু একটু করে বিকশিত হয় না; অবশ্য জানি, এ-কথা সহজে স্বীকার করে নিতে আমাদের অনেকেরই বাধবে। বিবর্তনবাদের প্রশ্ন তোলার কী দরকার? ভবিষ্যতের বুদ্ধ তো এখনই আছেন পাপীর অন্তরে; তার ভবিষ্যৎ আছে বর্তমানের মধ্যে। পাপীর মধ্যে, তোমার মধ্যে, সকলের মধ্যে আগামীদিনের যে বুদ্ধ লুকিয়ে আছেন তাঁকে চিনতে হবে। গোবিন্দ, এই সৃষ্টি অসম্পূর্ণ নয়; ধীরে ধীরে পূর্ণতার পথে বিবর্তিত হবার প্রয়োজন নেই এই সৃষ্টির। প্রতি মুহূর্তেই জগৎ পূর্ণ; প্রত্যেক পাপের সাথে আছে ঈশ্বরের কৃপা, প্রত্যেক বালকের মধ্যে আছে ভবিষ্যতের বৃদ্ধ, প্রত্যেক দুগ্ধপোষ্য শিশুর মধ্যে আছে মৃত্যুর বীজ, প্রত্যেক মুমূর্ষুর মধ্যে আছে অনন্ত জীবনের ইঙ্গিত। বুদ্ধ আছেন দস্যুর মধ্যে, জুয়াড়ির অন্তরে; আবার দস্যুর খোঁজ পাওয়া যাবে ব্রাহ্মণের মধ্যে। গভীর ধ্যানের সময়কালের ব্যবধান দূর করা সম্ভব হয়; যুগপৎ দেখা যায় সমগ্র অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অখণ্ড রূপ। আমার তাই মনে হয় জগতের সবকিছুই শুভ; জীবন ও মৃত্যু, পাপ ও পুণ্য, জ্ঞান ও নির্বুদ্ধিতা—সবই ভালো। এদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে আমাদের জীবনে; এদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে নিজেকে, স্বীকার করে নিতে হবে এদের, জগতের ভালো-মন্দ সবকিছুই সহানুভূতির চোখে দেখতে হবে। তাহলে জীবনের পথ সহজ হবে, কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের। দেহ দিয়ে, আত্মার ব্যাকুলতা দিয়ে উপলব্ধি করেছি পাপের প্রয়োজন ছিল

আমার জীবনে; ছিল কামের। সম্পত্তি আহরণের ও সংসারের ওপর বিতৃষ্ণা প্রয়োজন। এসব অভিজ্ঞতা লাভ না করলে মশগুল হয়ে থাকতাম কোনো এক ত্রুটিহীন কাল্পনিক জগতের স্বপ্ন নিয়ে। জীবনের ভালো-মন্দ সকল পথ অতিক্রম করে এসেছি বলে যে সংসারে বাস করি তাকে ভালোবাসতে পেরেছি, সংসারের একজন হতে পেরে সুখী হয়েছি। গোবিন্দ, আমার মনের কয়েকটি কথা তোমাকে বললাম।'

সিদ্ধার্থ নত হয়ে মাটি থেকে ছোট একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে গোবিন্দের সামনে ধরল। সিদ্ধার্থ বলল : 'এই যে পাথর দেখছ, এটাই হয়তো একদিন মাটি হবে; মাটি থেকে হবে গাছ, প্রাণী বা মানুষ। আমি হয়তো বলতাম : পাথরটা তো শুধুই পাথর; এর কোনো মূল্য নেই—কেবল মায়া। কিন্তু কালচক্রের বিবর্তনের ফলে একদিন এই পাথর হয়তো রূপান্তরিত হবে মানুষ কিংবা আত্মায়; সুতরাং পাথরেরও মূল্য আছে। আরো অনেক কথাই মনে আসত। কিন্তু এখন মনে হয় এই পাথর কেবলমাত্র পাথরই নয়; এর মধ্যে আছে প্রাণী, ঈশ্বর ও বুদ্ধ। আজ পাথর আছে, কিন্তু ভবিষ্যতে অন্যকিছুতে রূপান্তরিত হবে বলে এই পাথরখণ্ডকে ভালোবাসি না, অথবা মর্যাদা দেই না; এই একটুকরা পাথরের মধ্যে চিরদিন ধরে সবকিছু আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে বলেই একে ভালোবাসি। আজ এই মুহূর্তে পাথর হিসেবেই একে ভালোবাসি, ভবিষ্যতে কী রূপ হবে সে-কথা ভাবছি না, কারণ আমার কাছে পাথরের এটাই পূর্ণ রূপ। পাথরের প্রতিটি রেখায়, প্রত্যেকটি ছোট গর্তে, হলুদ ও ধূসর রঙে, কাঠিন্যে, শুষ্কতায় কিংবা আর্দ্রতায় আমি দেখতে পাই নতুন অর্থ ও বিশেষ মূল্য। কত রকমের পাথর আছে। কোনোটা তৈলাক্ত ও মসৃণ, কোনোটা শামুকের মতো, একটা হয়তো দেখায় পাতার মতো, আবার কোনোটা বালির মতো মুক্ত—প্রত্যেকটাই আলাদা, প্রত্যেকেই নিজের মতো করে 'ওম্'-এর সাধনা করছে, সকলেই ব্রহ্মা। কিন্তু থাক, পাথরের কথা আর বলব না। মনের ভাবনা কথায় ভালো করে প্রকাশ করা যায় না। প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তা অন্যরকম হয়ে পড়ে, অর্থ বিকৃত হয়, একটু যেন নির্বোধ মনে হয়। আমার বেশ মজা লাগে যখন দেখি একই কথা কারো কাছে খুব মূল্যবান, আবার কারো কাছে তা একান্ত অর্থহীন।'

গোবিন্দ নীরবে শুনল সিদ্ধার্থের কথা।

একটু দ্বিধার সাথে গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে পাথরের কথা বললে কেন?'

'কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি। উদ্দেশ্য ছিল না বলেই বুঝতে পারছ যে পাথর, নদী এবং সৃষ্টির যত বস্তু চোখের সামনে দেখতে পাই তাদের প্রত্যেককে ভালোবাসি। এদের কাছ থেকে শিক্ষাও লাভ করতে পারব। গোবিন্দ, আমি এখন পাথর, গাছ ও গাছের বাকল ভালোবাসতে শিখেছি। এরা সৃষ্টির অন্তর্গত বস্তু, বস্তুকেই তো ভালোবাসা যায়, ভালোবাসা যায় না শব্দকে। এজন্যই উপদেশের মূল্য নেই আমার কাছে, উপদেশের মধ্যে বস্তুর মতো কাঠিন্য নেই, কোমলতা নেই, রং নেই, আকার নেই, স্বাদ নেই—কথা ছাড়া আর কিছু নেই। কেবল কথা আর কথা শুনেছ, তাই বোধহয় তুমি শান্তি পাওনি। তোমার ধর্ম, তোমার মুক্তি চাপা পড়ে গেছে কথার নিচে। গোবিন্দ, সংসার ও নির্বাণ দুটি শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়। নির্বাণ কোনো বস্তু নয়, শুধুই একটি কথা।'

গোবিন্দ বলল, 'নির্বাণ শুধু কথা নয় বন্ধু; নির্বাণ একটি চিন্তা, ভাবনা ও মতবাদ।'

সিদ্ধার্থ উত্তর দিল, 'হতে পারে শব্দ চিন্তার বাহন, কিন্তু বন্ধু, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, আমি কথা ও চিন্তার মধ্যে খুব পার্থক্য দেখি না। সত্যি বলতে কী, আমি চিন্তা ও ভাবনাকে খুব বেশি মূল্য দিই না। সৃষ্টির প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি। আমার আগে এই খেয়াঘাটের যে মাঝি ছিল তার কাছে আমি অনেক শিখেছি। সে ছিল একজন সুপুরুষ, তার একমাত্র বিশ্বাস ছিল এই নদীর ওপরে; অন্যকিছুর ওপর আস্থা ছিল না। সে আবিষ্কার করেছিল যে নদী তার সঙ্গে কথা বলে, নদীর শব্দের মধ্যে সে শুনতে পেত কত কথা, তা থেকে মাঝি শিক্ষালাভ করেছে। নদী তার গুরু, তার কাছে দেবতার মতো। দীর্ঘকাল সে উপলব্ধি করতে পারেনি যে বাতাস, মেঘ, পাখি, পোকা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি নতুন জ্ঞান; নদীর মতো এরাও দেবাত্মা, এরাও শেখাতে পারে আমাদের! বনে যাবার আগে বৃদ্ধমাঝি এই সত্য এবং সব সত্য জেনে গেছে গুরুর সাহায্য ছাড়া এবং বই না পড়েও সে তোমার-আমার চেয়ে অনেক বেশি জানত। নদীর ওপর গভীর বিশ্বাস ছিল বলেই এত জ্ঞান লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।'

গোবিন্দ বলল, 'তুমি যাকে বস্তু বলছ তা কি সত্য, তা কি প্রকৃত? বস্তু কি শুধুই মায়া নয়, শুধুই কি কল্পনা ও ছায়া নয়?'

'তোমার এ প্রশ্নও আমাকে বিচলিত করে না', সিদ্ধার্থ বলল—'গাছ, পাথর, নদী যদি মায়া হয় তাহলে আমিও তো মায়া; সুতরাং সৃষ্টির সকল বস্তু আমার সহধর্মী, আমরা প্রত্যেকে একই শ্রেণীর। এজন্যই তো তাদের এত সমীহ করি, ভালোবাসি। আমার স্বগোত্র বলেই তাদের ভালোবাসতে পারি। আমার মতবাদ শুনে তুমি হয়তো হাসবে। গোবিন্দ, আমার মনে হয় ভালোবাসা সংসারের সবচেয়ে বড় জিনিস। বড় বড় দার্শনিকরা পৃথিবীকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন, সংসারের কর্মকাণ্ডের চমৎকার ব্যাখ্যা দিতে পারেন এবং ত্রিশটি-বিচ্যুতির জন্য পৃথিবীকে ঘৃণাও করতে পারেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় কথা এই পৃথিবীকে ভালোবাসা—তাকে ঘৃণা করা নয়। আমরা পরস্পরকে ভালোবাসব, এখানকার প্রত্যেকটি প্রাণী ও বস্তুকে ভালোবাসব, সম্মান করব, শ্রদ্ধা করব। এই সৃষ্টির সাথে যাব এক হয়ে।'

গোবিন্দ বলল, 'তোমার কথা বুঝতে পেরেছি। ঠিক একেই বুদ্ধদেব বলেছেন মায়া। তিনি শিখিয়েছেন দয়া, ক্ষমা, করুণা ও ধৈর্য—কিন্তু শেখাননি প্রেম। পার্থিব প্রেমে জড়িয়ে না পড়তে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন।'

সিদ্ধার্থের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, 'আমি জানি, গোবিন্দ আমি তা জানি। এখান থেকে শুরু হয় শব্দের দ্বন্দ্ব, অর্থের গোলকধাঁধা। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, আমার ধারণার সঙ্গে গৌতমের উপদেশের আছে সুস্পষ্ট বিরোধ। তাই কথার ওপর আমার আস্থা কম। কারণ আমি জেনেছি, অসংগতি ও বিরোধিতা শুধুই মিথ্যা মায়া। আমি উপলব্ধি করেছি গৌতমের শিক্ষার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই, আমাদের অনুভূতি এক। গৌতম মানবজীবনের অসারত্ব ও ক্ষণস্থায়িত্ব জেনেও মানুষকে এত ভালোবেসেছেন যে, এদের দুঃখে সান্ত্বনা দিতে এবং উপদেশ

দেবার জন্য নিজের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। এত মমতা যাঁর হৃদয়ে তাঁর পক্ষে প্রেমকে অস্বীকার করা কি সম্ভব? বুদ্ধকেও আমি তাঁর কথা দিয়ে বিচার করব না, তাঁর জীবন ও কাজের মূল্য তাঁর উপদেশের চেয়ে আমার কাছে অনেক বেশি। তাঁর মতামতের চেয়ে হাত নাড়বার ভঙ্গিটির মূল্য আমি বেশি দেই। বুদ্ধদেব তাঁর শিক্ষা এবং উপদেশের জন্য আমার শ্রদ্ধা লাভ করেননি, তিনি মহাপুরুষ হয়েছেন তাঁর কাজ ও জীবনের জন্য।'

দুই বৃদ্ধ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর গোবিন্দ যাওয়ার উদ্যোগ করে ধীরে ধীরে বলল, 'সিদ্ধার্থ, তোমার চিন্তা ও ভাবনাগুলো বলার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। তোমার অনেক কথাই সম্পূর্ণ নতুন লাগল। এখনই আমি সব কথার মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। সে যাই হোক তোমাকে ধন্যবাদ, তোমার দিনগুলো শান্তিময় হোক।'

গোবিন্দ মনে মনে ভাবছিল : 'কী বিচিত্র মানুষ সিদ্ধার্থ, কী অদ্ভুত তার মতামত। তার ধারণাগুলো অনেক সময় পাগলামি মনে হয়। ভগবান বুদ্ধের শিক্ষার সাথে কত গভীর পার্থক্য! তাঁর শিক্ষা স্পষ্ট, সরল, সহজেই বুঝা যায়; তাঁর শিক্ষার মধ্যে অদ্ভুত বা হাস্যকর কিছু নেই। কিন্তু সিদ্ধার্থের হাত ও পা, তার চোখ, তার ভ্রু, তার শ্বাস-প্রশ্বাস, তার হাসি, তার অভিবাদন, তার চলার ভঙ্গি আমাকে নূতনভাবে আকর্ষণ করে।' বুদ্ধের নির্বাণ লাভের পর গোবিন্দ সিদ্ধার্থ ছাড়া এমন আর কাউকে দেখেনি যার দিকে চেয়ে বলা যায় : ইনি একজন সাধুপুরুষ! তার মতামত অদ্ভুত হতে পারে, তার কথাবার্তা অনেক সময় হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু তার দৃষ্টি ও হাত, ত্বক ও কেশ থেকে যে পবিত্রতা, শান্তি, কোমলতা ও পুণ্যজ্যোতি বিচ্ছুরিত হয়, বুদ্ধের নির্বাণলাভের পর আর কারো মাঝেই সে তা দেখতে পায়নি।

এসব কথা ভাবতে ভাবতে গোবিন্দের মনে জেগেছে দ্বন্দ্ব; তবু সিদ্ধার্থের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করল সে। সিদ্ধার্থের স্থিরমূর্তির সামনে গোবিন্দ ধীরে ধীরে মাথা নত করল।

গোবিন্দ বলল, 'সিদ্ধার্থ, আমরা বৃদ্ধ হয়েছি; এ জীবনে আমাদের হয়তো আর দেখা হবে না। বন্ধু, আজ দেখছি তুমি শান্তি পেয়েছ। বুঝতে পারছি, আমি সে শান্তি পাইনি। বন্ধু, আর একটি কথা আমাকে বলো যে-কথা আমি হৃদয়ঙ্গম করতে পারব, বুঝতে পারব! জীবনের বাকি পথ চলার জন্য কিছু পাথেয় দাও, সাহায্য কর আমাকে! আমার পথ বড় দুর্গম, বড় অন্ধকার মনে হয়। আলো দাও, আশা দাও তোমার বন্ধুকে!'

সিদ্ধার্থ নীরবে চোখ তুলে চাইল; মুখে প্রশান্ত হাসি। গোবিন্দ উৎকণ্ঠা ও আগ্রহে ব্যাকুল হয়ে বন্ধুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। দীর্ঘদিনের ক্লেশ, অবিরাম অনুসন্ধান ও ক্রমাগত ব্যর্থতা গোবিন্দের মুখের ওপর দারুণ রেখাপাত করেছে।

সিদ্ধার্থ তা লক্ষ করল, মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল।

গোবিন্দের কানে চুপি চুপি বলল, 'মুখ নত কর; এদিকে, আরো, আরো কাছে এসো! গোবিন্দ, আমার কপালে চুমো দাও।'

বিস্মিত হল গোবিন্দ; তাহলে কি মহৎ প্রেম তাকে যেন বাধ্য করল সিদ্ধার্থের

নির্দেশ পালন করতে। গোবিন্দ কাছে এল সিদ্ধার্থের, নত হয়ে তার ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করল সিদ্ধার্থের কপাল। আর তৎক্ষণাৎ কী এক আশ্চর্য রূপান্তর ঘটল তার মধ্যে। তখনো গোবিন্দ মনে মনে বিচার করে দেখছিল সিদ্ধার্থের অদ্ভুত কথাগুলো, সময়ের অখণ্ডতা উপলব্ধি করার জন্য তখনো সে বৃথা চেষ্টা করছে, কল্পনা করতে চেষ্টা করছে সংসার ও নির্বাণ এক; বন্ধুর কথা রেখেছে, সহস্র সহস্র জন্ম-মৃত্যুকে এই হাসি দিয়েছে সমকালীনতা। গোবিন্দের মনে হল, সিদ্ধার্থের এই আশ্চর্য হাসি অবিকল বুদ্ধের শান্ত, কোমল, দুর্জ্ঞেয়, বিজ্ঞ, করুণাব্যঞ্জক অথবা বিদ্রূপাত্মক হাসির মতো বিচিত্র গুণসম্পন্ন। কতবার বুদ্ধের মুখে এই আশ্চর্য হাসি দেখে বিস্মিত হয়েছে গোবিন্দ। আজ সেই হাসি সিদ্ধার্থের মুখে দেখতে পেল।

গোবিন্দ ভুলে গেল সময়ের অস্তিত্ব, ভুলে গেল মুখের মিছিল, সে যেন দেখছে শুধু এক মুহূর্ত অথবা এক শতাব্দী ধরে; সে সিদ্ধার্থকে দেখেছে না, গৌতমকে তার আর মনে পড়ে না; স্বর্গের একটি তীর গভীরভাবে বিদ্ধ করছে গোবিন্দকে, সেই আঘাত তাকে দিয়েছে আনন্দ, সম্মোহিত করেছে, উল্লসিত করেছে। মাত্র যে মুখ বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল মুখ ও আকারের রঙ্গমঞ্চ হয়েছিল, সিদ্ধার্থের সেই প্রশান্ত মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে গোবিন্দ কিছুক্ষণ নীরবে চেয়ে থাকল। হাজার হাজার মূর্তির ছায়া-মিছিল অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও সিদ্ধার্থের মুখে প্রশান্তি বদলায়নি। ঠিক বুদ্ধের মতো তার মুখে লেগে আছে শান্ত-কোমল হাসি, সে হাসি একটু রহস্যময়—হয়তো আছে করুণা, হয়তো-বা বিদ্রূপ।

গোবিন্দের মাথা শ্রদ্ধায় আরো নত হল। তার শুষ্ক গাল বেয়ে নেমে এল অবাধ্য অশ্রুধারা। এক মহৎ, সর্বব্যাপী প্রেমের অনুভূতি তাকে অভিভূত করেছে, সে অভিভূত হয়েছে বিনীত শ্রদ্ধায়। সিদ্ধার্থের অচঞ্চল মূর্তি ও প্রশান্ত হাসির দিকে চেয়ে চেয়ে গোবিন্দের একসঙ্গে মনে পড়ে গেল জীবনে যা-কিছু সে ভালোবেসেছে, যা-কিছুকে পবিত্র বলে গ্রহণ করেছে এবং যা-কিছু কষ্ট জীবনে সে স্বীকার করেছে, তার সামনে যে লোকটি নিশ্চল হয়ে বসে আছে, তার মধ্যে এক হয়ে গেছে গোবিন্দের সে সকল মহৎ আদর্শ, মহৎ অভিজ্ঞতা।

গোবিন্দ মাটিতে মাথা রেখে তাকে প্রণাম করল।

সমাপ্ত